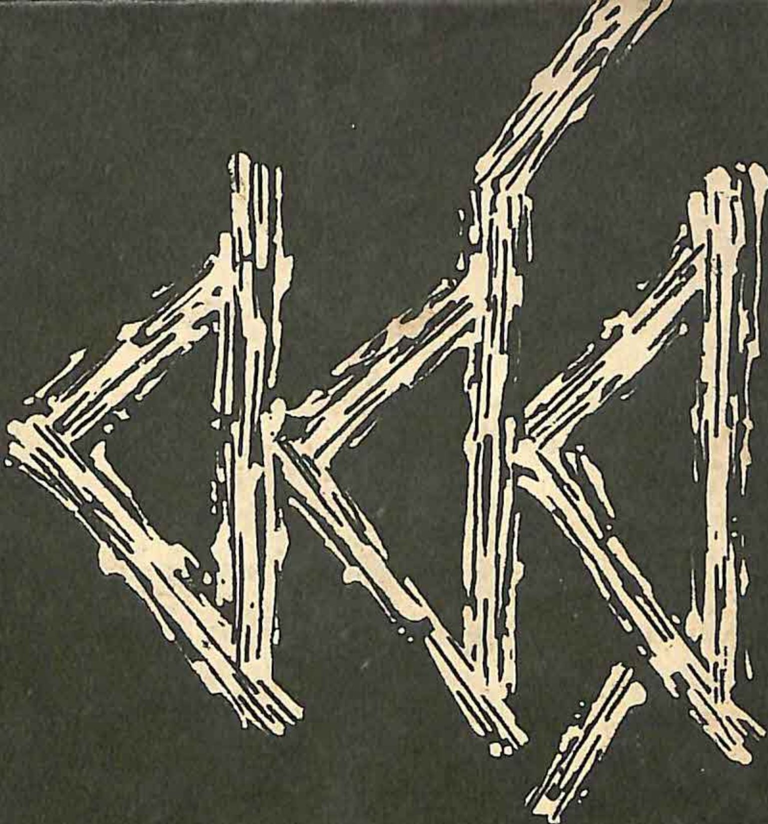


যুগের পর

প্রেমেন্দ্র মিত্র



বর্বর যুগের পর

বর্বর যুগের পর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কথামালা প্রকাশনী

প্রকাশক : বীরেশ্বর বসু
কথামালা প্রকাশনী
১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২।

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৬

দাম : দু'টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

প্রচ্ছদ শিল্পী : সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক : শ্রীসুরেন্দ্র নাথ পান
নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

শ্রীঅবনী ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

॥ সূচী ॥

বর্বর যুগের পর	...	১
কাব্য প্রসঙ্গে	...	৯
বোম্বাই	...	২০
উপন্যাস প্রসঙ্গে	...	২৯
কবি মোহিতলাল	...	৩৭
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪২
আধুনিক কবিতার ছলাকলা	...	৪৮
গ্রন্থ পার্বণ	...	৫৮
শোক, সংশয়, সাহস	...	৬২
এই তারিখ	...	৬৭

বর্বর যুগের পর

অনেকদিন আগের কথা।

কালিঘাটের একটি রাস্তায় যেতে যেতে একটি ছোট ছেলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত।

কালিঘাটের সে রাস্তা লম্বায় চওড়ায় তেমনি আছে, শুধু তার চেহারা গেছে বদলে।

হয়ত ছোট ছেলেরা এখনো আপন খেয়ালে ঘুরতে ঘুরতে আজও সেখানে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিনের সেই ছোট ছেলেটি যা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে চলৎশক্তিহীন হতো সে দৃশ্য আর সেখানে দেখা যায় না।

সেদিনের ছোট ছেলেটির সবিস্ময় কৌতূহলের বস্তু ছিল একটি বিশেষ ধরনের ছবি। রাস্তার ধারে সঙ্কীর্ণ ছোট দোকানের মাদুর পাতা মেঝেতে উবু হয়ে বসে তুলির কয়েকটি নির্ভুল টানে নিতান্ত নগণ্য চেহারার ময়লা জামাকাপড়-পরা পটুয়াকে মজার সব অদ্ভুত ছবি ফুটিয়ে তুলতে সে দেখেছে।

হাওয়া তখনই বদলাতে সুরু করেছে। যে দোকানে বসে পটুয়ারা তাদের এইসব ছবি আঁকে তারই দেওয়ালে বিদেশ থেকে ছেপে-আসা জমকালো রঙের দেবদেবীর ছবি তখন খদ্দেরদের মনোহরণ করে নিয়েছে। পটুয়ার তুলিতে আঁকা ছবির আর কদর নেই। মন্দিরে তীর্থ করতে যারা আসে

ঘর সাজাবার জন্য ওই বিদেশী রঙচঙে ছবিই তারা কিনে নিয়ে যায়। তবু পটুয়া যে তখনো তার তুলি রং ফেলে না দিয়ে দোকানদারীর অবসরে মেঝেয় কাগজ পেতে আঁকতে বসে, সে বোধ হয় শুধু অভ্যাসের দোষে।

তারপর সে যুগও বদলে গেল। কালিঘাটের সে রাস্তায় ছবির দোকান এখনো আছে, কিন্তু সে একেবারে অন্য জাতের ছবি। দোকানের মেঝেতে তো নয়ই, সে পটুয়াকে কোথাও আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পরলোকগত বাংলার কোনো দরদী মনীষীর উৎসাহে পরিণত বয়সে তাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা একবার করেছিলাম। খুঁজতে যেতে হয়েছিল অনেক দূর।

খাস কলকাতা নগদ পয়সায় ফেঁপে উঠে যত বিস্তৃত হয়েছে, এই সব ভুলে-যাওয়া শিল্পীদের তত ঠেলে নিয়ে গিয়েছে অনাবশ্যক জঞ্জালের মত শহরের দূরতম সীমান্তে। সে পটুয়ারা তো নেই-ই, তাদের বংশধরেরাও জীবিকার প্রয়োজনে সে নিরর্থক পেশা ছেড়ে কেউ পাটকলে কেউ ওই-রকম আর কোথাও এখন হাজিরা দেয়। রক্তের ডাক যারা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেনি তারা প্রতিমা গড়া কুমোর-দের জন্যে সস্তা চালচিত্র আঁকে।

সেকেলে সে সব ছবির কথা জিজ্ঞাসা করায় তারা অনেকেই ঘাড় নেড়েছে। কোথায় পাবে সে সব ছবি? তাদের বাপ-দাদারা আঁকত বটে, তাদের সঙ্গেই সে আঁকার বিদ্যে গিয়েছে শেষ হয়ে।

ওরই মধ্যে দু'একজন অনেক পেড়াপেড়ীতে কিম্বা যথেষ্ট

বকশিষ পাওয়ার আশ্বাসে, নিয়ে গেছে শহর সীমান্তের তাদের টিন কি খোলায় ছাওয়া কুঁড়েতে। তারপর চালের বাতায় গোঁজা পাকানো কাগজের বাণ্ডিল বার করে বেশ একটু কুণ্ঠিত ভাবেই মেলে ধরেছে। এ বস্তুর জন্যে কেউ উৎসুক হতে পারে এ বিশ্বাসটুকুও তাদের আর নেই। কাগজের বাণ্ডিলের অবস্থা অবশ্য শোচনীয়। কালের ধর্মে, ঝুলে ধোঁয়ায় সেগুলি বিবর্ণ শুধু নয়, খসে যাবার মত হয়েছে। শিল্পরসিক কীটেরাই তাকে রেহাই দেয়নি।

এই জীর্ণ বাণ্ডিলের ভেতর থেকেও যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অক্ষত ছবি বেরিয়েছে তা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায়নি। শুধু যে তার মধ্যে ওস্তাদের হাতের কাজ আছে তা নয়, হাত যাদের পাকেনি, নকল করে কাজ চালিয়ে যাবার নক্সাও তাদের জন্য ছকে রাখা আছে।

যাঁর সঙ্গে এ ছবি সংগ্রহে গেছলাম তিনি আশাতীত মূল্য দিয়ে সব কিছুই নিয়েছেন এবং তারপর তাঁর ও আরো অনেক লুপ্তশিল্প-সন্ধানী রসিক সমঝদারের মারফৎ এই হারানো পটুয়াদের ছবি সম্বন্ধে মূল্যবান সব সন্দর্ভ অভিজাত বহু পত্রিকায় পড়বার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। বর্তমান কালের বিখ্যাত যে কোন শিল্পীর ছবিতে সেই হারানো যুগের ধারা থেকে নতুন প্রবাহ স্বষ্টির দৃষ্টান্তও আমরা পাচ্ছি। বড় বড় চিত্র-প্রদর্শনী কি সমৃদ্ধ রসিকজনের বাড়িতে গেলে পরিচ্ছন্ন করে বাঁধান ও পরিপাটি করে সাজানো এ সব ছবি আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ দোকানঘরের ময়লা মাদুরে বসে

আঁকবার পটুয়া আর নামমাত্র মূল্যে তা কেনবার সাধারণ গুণগ্রাহী খদ্দের আজ আর কোথাও নেই।

শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা দুনিয়ারই শিল্পকলার জগতের পক্ষে এটি এমন একটি আপাত-অকিঞ্চিৎকর ঘটনা যার তাৎপর্য তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে শিল্প সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আত্মপ্রসাদ বেশ একটু চিড় খায়।

এতক্ষণ কালিঘাটের পট ও পটুয়াদের কথা যে বলছিলাম তা বলাই বাহুল্য। এ সব এখন রসিক সংগ্রাহকদের সাত রাজার ধন, সমঝদার সমালোচকদের হাতের পাঁচ। কিন্তু যাদের অনুগ্রহে উৎসাহে ও যাদের মুখ চেয়ে এ পট একদিন জন্ম নিয়েছিল তাদের কাছে এ পট আজ কাগজের দামেও আর বেচা যায় কি?

তা যে যায় না, এই লজ্জাকর সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। আর এ সত্যের আলোয় দেখলে এ যুগের সমস্ত সৌন্দর্য-চর্চার ভিত-ই বুঝি বেশ কিছুটা ধ্বসে পড়ে।

সেদিন কালিঘাটের পট যারা এঁকেছে, ক্ষমতা তাদের যত অসাধারণই হোক, তারা সমৃদ্ধ বিদগ্ধ সমাজের কেউ নয়। সে পট যারা কিনেছে তারাও নেহাৎ সাধারণ লোক। দামী মোটা কেতাব লিখে এ পটের কেরামতি ব্যাখ্যা করবার বিদ্যে না থাকলেও, তার রসগ্রহণের ক্ষমতা তাদের ছিল বলেই এ পটের তখন কদর হয়েছে।

দেখতে দেখতে তাদের সে রসবোধ শুকিয়ে গেল কি করে? গেল, হঠাৎ এক বর্বর সমাজের অভ্যুত্থানে নয় কি?

ইতিহাসে বর্বরদের আক্রমণে বহুদিনের সমৃদ্ধ শিল্প

সংস্কৃতির বিলুপ্তির এমন দৃষ্টান্ত আমাদের অনেক জানা আছে। এখানে তফাৎ শুধু আক্রমণের বদলে অভ্যুত্থানের।

এই দেশেই ঐতিহাসিক কয়েকটি দুর্ঘটনায় ও অর্থনৈতিক কয়েকটি নিয়মের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় বর্বর এক সমাজ বলতে গেলে এই সেদিন হঠাৎ জেগে উঠেছিল।

সে বর্বর সমাজ আর কেউ নয়, আমরা,—কোম্পানীর দৌলতে যাদের পসার প্রতিপত্তি শুরু, সেই তথাকথিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কলমবাগীশ কেরানী ও জমির উপস্বত্বভোগী শ্রেণী।

এই শ্রেণীর উদ্ভবের আগে এ দেশে শিল্প সংস্কৃতির একটা অক্ষুণ্ণ অব্যাহত সর্বজনীন ধারা চলে আসছিল একথা যেমন মিথ্যা, তেমনি এই নব বর্বর সমাজের আবির্ভাবের পর আমাদের সমস্ত স্বাভাবিক শিল্প প্রেরণায় যে আকস্মিক ছেদ পড়েছিল একথাও সম্পূর্ণভাবে সত্য।

বিদেশী বণিকদের প্রয়োজনে ও নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্রয়ে উদ্ভূত হয়ে এই নব পাশ্চাত্য-শিক্ষা-সন্ধানীরা এ দেশের ইতিহাসের ধারা বদলানোর ব্যাপারে অনেক বড় ভূমিকা নিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন কোন দিকে এ দেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগ যে কখন তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তা বোধ হয় টেরও পায়নি।

বিদেশী মনিবের মন-যোগানো ভাষা শিখতে গিয়ে সে মনিবের ওপরেও টেক্কা দিয়ে তার দেশের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তারা পাতিয়েছে নিজের দেশ তাদের কাছে তত দূর হয়ে পড়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে এই ব্যবধানের সূত্রপাত, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তা প্রায় দুস্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে কালিঘাটের পটের মত এ দেশের অনেক কিছুরই তখন কোন আবেদন নেই। সে যুগে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে যাঁদের জন্ম তাঁরা স্মরণ করে দেখতে পারেন তাঁদের শৈশব কৈশোরে নিজেদের পরিবারে কি ধরনের শিল্পবোধের পরিচয় তাঁরা পেয়েছেন।

কৃষ্ণনগরের পুতুলকে ছোটদের মজার খেলনা হিসাবে কিছুটা মূল্য দিলেও কালিঘাটের পট তখন দৃষ্টিপাতের অযোগ্য। কবির লড়াই কি ঝুমুর, যাত্রা কি কথকতা, এমন কি কীর্তনের পর্যন্ত, হয় অশিক্ষিত নয় ধর্মানুরাগীদের মহলের বাইরে বিশেষ কোন খাতির নেই। নেহাৎ ধর্মের অনুষ্ঠান আচারের সঙ্গে জড়িত থাকার দরুণ ডাকের সাজ কি প্রতিমা গড়ার মত কোন কোন শিল্পধারা সমর্থন পেলেও সম্মান পায় না। তথাকথিত শিক্ষিত সাধারণ তখনও কোঁচা দেওয়া ধুতির ওপর ডবল ব্রেষ্ট সার্ট গায়ে চড়িয়ে ফিতে-বাঁধা জুতো না পাম্পস্ু পরবে স্থির করতে পারেনি। ধনীদের বাড়ির বৈঠকখানায় বড় বড় বিলেতি ছবি আর ইটালীয়ান ভাস্কর্যের নকল সাজানো থাকে। বড় বড় মোকান তৈরী করার মুরদ যাদের আছে তারা গ্রীক রোম্যান কলোনিয়্যালের খিচুড়ি বানিয়ে মোটা মোটা থাম দেওয়া প্রাসাদ তোলে। সে প্রাসাদের বাগানে অর্ধোলঙ্গ বিদেশী ভাস্কর্যের নারীমূর্তি শোভা পায়।

ব্যতিক্রম যে এর মধ্যে ছিল তা আগেই বলেছি। এই

বর্বরতার প্লাবনের মধ্যে শিল্প সংস্কৃতির প্রাণবীজ কেউ কেউ সযত্নে সন্তর্পণে লালন করেছেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে প্লাবিত দেশের মধ্যে এইসব বিচ্ছিন্ন অপরিসর দ্বীপ অধিকাংশই ঠাকুর বাড়ির মত বনেদী সম্ভ্রান্ত পরিবারের— আধুনিক কালকে উপেক্ষা না করেও যাঁরা প্রাচীন প্রাণশিখাকে নির্বাপিত হতে দেননি। অনেক সময়ে তাঁদের অনেকে নিজেদের লুপ্তসত্তা পুনরাবিষ্কারও করেছেন এবং তার জন্যে ব্যঙ্গ কৌতুক উপহাসের পাত্রও তাঁদের কম হতে হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ভারতীয় তুলির টান বিদগ্ধ রসিক সমাজের অভিনন্দন পেলেও সাধারণের বিমূঢ় বিদ্রূপের খোরাক যে তখন জুগিয়েছে একথা লজ্জাকর হলেও লুকোবার নয়। পরম দুঃসাহসে প্রথম যে বাঙালী মহিলা দেশীয় নৃত্য-কলার পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, কি সকৌতুক বিদ্রূপের অভ্যর্থনা তাঁর ঐ প্রচেষ্টা সাধারণের মধ্যে পেয়েছিল তা হয়ত অনেকেরই এখনও স্মরণ আছে।

তারপর ইতিহাসের চিরন্তন সত্যই আবার প্রমাণিত হলো। বর্বরেরা গোড়ায় যা ধ্বংস করে শেষে তারই ধারক হয়ে দাঁড়ায়। এদেশেও তাই হয়েছে। সেদিনের সেই নববর্বর সমাজই আজ নিজেদের শিল্পসত্তাকে নতুন করে খুঁজে পেয়ে তার সত্যকার সাধক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে ইতিমধ্যে যন্ত্রযুগের কল্যাণে আমাদের জীবনের ভিত্তিই যাচ্ছে বদলে। জীবনের ধারার সঙ্গে জড়ানো যে শিল্পবোধ তাকে সার্থক করার উপায়ই এখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে। শুধু এখানকার নয়, সারা

দুনিয়ারই এই এক সমস্যা। শিল্প মাত্রেই এখন একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বস্তু, বিশেষ অবসর সংগ্রহ করে যা উপভোগ করতে হয়। সে বিশেষ অবসর আবার সকলের লভ্য নয়।

রম্য কলাচর্চায় উৎসাহের অভাব কি ত্রুটি আর আমাদের নেই, কিন্তু ছেঁড়া মাদুরে কি ময়লা পোশাকে না হোক, যে কোন বেশে যে কোন রূপে কালিঘাটের সে নামহীন পটুয়া মন্দির কি হাটের পথের ধারে তার রঙের বাটি নিয়ে আবার কোনদিন এসে বসবে যদি ভাবতে পারতাম!

ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছি এখানকার কবিবন্ধুদের আহ্বানে তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে। যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যে তাঁরা আমায় ডেকেছেন তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানানো বাহুল্য। হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে যদি আসে তাহলে তা নিশ্চয় মার্জনীয়।

বাংলা থেকে গুজরাটের ভৌগোলিক দূরত্ব কম নয়। আধুনিক যন্ত্র সে দূরত্বকে কমিয়ে দিয়েছে সত্য কিন্তু সে শুধু বাইরের দিক দিয়ে। বাইরের দূরত্ব হ্রাস করলেই ভেতরের দূরত্ব যে ঘোচে না বর্তমান যুগে তার প্রমাণের অভাব নেই। স্থল জল আকাশের নব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রযানের কল্যাণে পৃথিবী এখন অনেক ছোট হয়ে এসেছে কিন্তু জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে ব্যবধান বুঝি আরো বেড়েছে।

বাইরের দূরত্ব যতই ঘুচুক মনের দূরত্ব না ঘুচলে সত্যিকার মিলন নেই। মনের দেয়াল উঁচু হলে পাশের বাড়িও পৃথিবীর অন্য প্রান্তের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য ও সৌভাগ্য এই যে, এই বিরাট দেশের ভৌগোলিক বিস্তার আমাদের ঐক্যকে কোন-দিন ব্যাহত করতে পারেনি। আধুনিক যন্ত্রযুগ ছ-মাসের পথ ছ-দণ্ডে পার করে দেবার অনেক আগেই মনের দূরত্ব আমরা ঘুচিয়ে দিয়েছি। আর সে দূরত্ব ঘুচিয়েছি প্রধানতঃ সাহিত্য

দিয়েই। গুজরাট আর বাংলা সেই সাহিত্যের ভেতর দিয়ে একই সুরে বাঁধা। কবি নরসিং দাস মাহেতার মধ্যে আমাদের শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠধ্বনিই আমরা শুনেছি। গুজরাটের প্রথম ব্রজভাষার কবি ভালনের ভক্তিরসাত্মক কাব্য শুনতে শুনতে আমাদের বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে তাঁদের গভীর আত্মীয়তার কথাই মনে পড়েছে।

যেখানে যতদূরেই থাকি না সমস্ত ভারতবর্ষ যে এক অখণ্ড প্রাণের যোগসূত্রে বাঁধা যুগে যুগে আমাদের সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত তার প্রমাণ দিয়ে এসেছে।

আজ এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ভারতের নব-জীবনের সূচনার দিনে এই কবি সম্মেলনে আমাদের প্রাণের সেই রাখীবন্ধনই অটুট রাখবার চিরন্তন প্রেরণা আমরা যেন পাই।

কবি হিসেবে আপনারা আমায় এ সম্মেলনে ডেকেছেন। আপনাদের সাদর আহ্বানের মর্যাদা আমি রাখতে পারব সে ভরসা কিন্তু আমার খুব কম। কবিতা আমি লিখি, সে লেখা আপনাদের কিছু আনন্দ নিশ্চয়ই দেয়, নইলে আমায় আপনারা স্মরণ করবেনই বা কেন? কিন্তু কবিতা লেখা আর কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলা 'ত এক কথা নয়। দ্বিতীয় কাজটা কবিতা লেখার চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশী কঠিন। কবিতার কথা বলতে গেলে তার শাস্ত্রের কথা এসে পড়ে। আর ওই শাস্ত্র জিনিষটিকে শ্রদ্ধা যথেষ্ট করলেও মনে মনে আমি ডরাই। আমাদের মধ্যে এমন অনেক শক্তিমান কবি আছেন যাঁরা যে কলমে কবিতা লেখেন সেই কলম ছুরির মত

চালিয়ে কবিতার চুলচেরা বিশ্লেষণও করতে পারেন। তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি, ঈর্ষ্যাও করি বোধহয় একটু। কিন্তু তাঁদের এই দুর্লভ দুধারী কলম আমি পাইনি।

তাই কবিতার শাস্ত্র কথা আমার কাছে শোনবার আশা করবেন না। বরং যা আমার সাধ্যায়ত্ত সেই কথাই আমি বলবার চেষ্টা করব। কবিতা কেন আমরা লিখি, কি লিখতে চাই, বর্তমান যুগে কবিতার মূল্য ও প্রয়োজন কতটুকু এই সব ভাবনা আজ আপনাদের সামনে আমি মেলে ধরতে চাই।

সত্যি কথা যদি স্বীকার করি তাহলে বলব কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ একটু আশঙ্কা আমাদের সকলের মনেই বোধহয় জাগছে। মানুষের কণ্ঠ প্রথম নাকি ছন্দেই মুখর হয়েছে। ভাষার প্রথম উচ্চারণই বুঝি পদ্যের দোলায়। সে দোলা থামিয়ে পদ্যকে সমতল গদ্য করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছে। গদ্য তার যত শক্তিশালী-ই হয়ে উঠুক সেদিন পর্যন্ত কিন্তু পদ্যের প্রাধান্য ছিল অক্ষুণ্ণ। হাট বাজার ঘর সংসার সাধারণ জীবনযাত্রার সব প্রয়োজন গদ্য দিয়ে সারলেও মানুষের প্রাণের সুর পদ্যেই বাঁধা ছিল। ধর্মকথা শাস্ত্রকথা ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধের ধারা যা বেঁধে দেয় সেই ইতিহাস পুরাণ মানুষ পদ্যেই শুনেছে, জীবনের গভীরতম কামনা বাসনা আনন্দ বেদনা উন্মাদনা প্রকাশ করেছেও তাইতে। সে পদ্য কখনো সুরের ধারায় বয়ে গান হয়ে উঠেছে, কখনো হয় নি, কিন্তু গদ্যের সীমা ছাড়িয়েই তা মানুষের গভীর প্রাণকে স্পর্শ করেছে।

পদ্য বা কাব্য যাই বলি সেদিনকার কবির মুখের কথা

ছন্দের দোলায় দুলত কিন্তু সর্বসাধারণের কাছেই পৌঁছোবার জন্যে। গোনাগুনতি বাছাই করা কজনের জন্যে নয়, সকলের জন্যেই ছিল তার দরাজ নিমন্ত্রণ ছড়ানো।

কবিরা তাই সেদিন দেশের সমাজের অত্যন্ত অপরিহার্য অঙ্গ ছিলেন। ভয়ে ভক্তিতে কখনো সখনো তাঁরা প্রবলের চাটুকারিতা করেছেন হয়ত চারণের ছদ্মবেশে, ধর্মের নামে বুজরুগীর ব্যবসাতেও নিজেদের গলা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ধার দিয়েছেন কিন্তু জনসাধারণকে অবজ্ঞা করে তাদের কাছ থেকে সরে থাকতে চান নি কখনই। রাজসভার উচ্চাসনে বসেও তাঁরা জনসাধারণকে ভোলেন নি, রাজাকে প্রসন্ন করার ছলে প্রজার উদ্দেশেই তাঁদের কবিকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। কণ্ঠ থেকে কলমে ও কলম থেকে ছাপার হরফে পৌঁছোবার পর থেকেই কাব্যের এমন কয়েকটি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যা ভাবিয়ে তোলবার মত। কবিতা শুধু জনগণের গড়পড়তা মনের মাপেই রচনা করা হবে এমন কথা নিশ্চয় কেউ বলতে চান না। আগেকার যুগের মহৎ কবিরাও তা করেন নি। কিন্তু যত গভীর যত সূক্ষ্মই হোক কাব্য সেদিন সকলের কাছে পৌঁছোবার জন্যেই ব্যাকুল হয়েছে, দল কি গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথক হয়ে থাকাটাকেই গৌরব বলে মনে করেনি। নিজের দেশে কালে রসিক বোদ্ধা না পেয়ে যিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন সেই ভবভূতিও নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথ্বীতে সহৃদয় পাঠকের সন্ধানই করেছেন, নিজের দুর্বোধ্যতার দম্ভে আত্মতৃপ্তি পান নি।

কবিতা সকলের কাছে জলের মত সহজ হবে এমন কথা

নিশ্চয়ই নেই। কবিতা লিখতে যেমন কবিকে, কবিতা বুঝতে তেমনি পাঠককেও নিজেকে তৈরী করতে হবে অবশ্যই। মনের তার যার বাঁধা নেই, সে ঝঙ্কার তুলতেও যেমন পারে না—তেমনি গ্রহণ করতেও নয়। কবিতার ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের আটপৌরে ভাষা থেকে আলাদা কিছু না হতে পারে, কিন্তু তার শব্দের অর্থ ও ধ্বনির রেশ আলাদা। সেই রেশ ধরবার মত সজাগ কান সব সময়ে সহজাত হয় না। আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু গদ্য থেকে কবিতার এই ভিন্ন প্রকৃতির কথা স্বীকার করার পরেও বলতে হয় যে কান থেকে প্রাণে পৌঁছোবার সহজ রাস্তাটা খোঁজাই কবিতার সব চেয়ে বড় সাধনা। সেই সাধনা যদি নিজের লক্ষ্য ভুলে সম্পূর্ণ উল্টো রাস্তাতেই চলে, বোঝাতে চাওয়ার চেয়ে না বোঝানোই যদি তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, পাঠকের মনে প্রবেশের পথ না হয়ে ভাষা যদি নিষেধের পাঁচিল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়—তাহলে কবিতার কোন সার্থকতাই আছে কিনা সন্দেহ।

আজকালকার উন্নাসিক কবিতার আলোচনায় কয়েকটি কথা প্রায় শোনা যায়। কবিতার আঙ্গিক, চিত্রকল্প কবিকর্ম কাকে বলে, শব্দই যে কবিতার সার সেই তত্ত্ব, কবিতার বুদ্ধিগত যুক্তিগত অর্থ আদৌ বাঞ্ছনীয় কি না, ইত্যাদি। কথাগুলো যে নতুন তা নয়। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের কথা যদি আমরা একটু তলিয়ে বুঝি তাহলে দেখতে পাব কবিতার বিষয়ে এসব তত্ত্ববিচার তাঁরা অনেক আগেই করে গেছেন, কিন্তু এখন বিদেশী লেবেলে সেই সব কথাই আমদানি

হয়ে যাঁদের হুজুগে মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে তাঁরা শুধু লেবেলের মোহে কবিতার আসল স্বরূপ সম্বন্ধেই অন্ধ হয়ে আছেন কি না সেটাই ভাববার বিষয়। কবিতায় কবিকর্ম অর্থাৎ কারুকাজ ত থাকবেই, সেটা সজ্ঞানে সচেতনভাবে করলেও ক্ষতি নেই কিন্তু অলঙ্কারের বাহুল্যে কবিতার আসল রূপই যদি অবান্তর হয়ে যায় তাহলে সেটা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয় নয়। অলঙ্করণ সে যুগেও ছিল, এযুগে তার রকমফের হয়েছে, পরেও হবে। অলঙ্করণের প্রয়োজনও আছে সন্দেহ নেই কিন্তু তার মাত্রা নির্ণয় করবে সেই গভীর সুষমাবোধ যা রূপকে ঢেকে না দিয়ে তাকে সার্থক ভাবে আরো পরিস্ফুট করে তুলতেই তৎপর।

অলঙ্করণের বেলা যেমন, শব্দের প্রাধান্যের বেলাতেও সেই সত্যদৃষ্টির পরিমিতিবোধই আসল। শব্দই কবিতার একমাত্র মূলধন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। একথা শোনবার জন্যে আরাগঁর দ্বারস্থ না হয়ে শ্রদ্ধা থাকলে বহু পূর্বের দণ্ডীর কাছেই আমরা শুনতে পেতাম—

> ইদমন্ধতমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্
> যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারমং ন দীপ্যতে।

কবিতা একান্তভাবে শব্দনির্ভর বলে, শব্দ নিয়ে যে কোন ছিনিমিনি ছেলেখেলাই কবিতার পরাকাষ্ঠা, কোন এক Dylan Thomas কি Cummings-এর নজির থেকেই তা মানতে প্রস্তুত হওয়াটা মনের সুস্থতার লক্ষণ অন্ততঃ বলতে ইচ্ছে হয় না।

আমাদের প্রাচীন কাব্য-তাত্ত্বিকরা শব্দের মূল্য স্বীকার করেও তাই বলেছিলেন—

শব্দার্থ শাসনজ্ঞান মাত্রেণৈব ন বেদ্যতে
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্
—ধ্বন্যালোক

অর্থাৎ—কাব্যের আসল প্রাণ যে ধ্বনি তা শুধু শব্দের ওপর দখল ও তার জ্ঞান থেকেই পাওয়া যায় না।

অলঙ্করণ শব্দমূল্য রূপকল্প আঙ্গিক সব কিছু উপাদান বিচার করেও তাই আমাদের আলঙ্কারিকেরা শেষ যে সত্যে পৌঁছেছিলেন তা হল এই যে কাব্যের সব কিছু গুণ ছাড়িয়েও যা তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তা হল ধ্বনি। সে ধ্বনি কেমন, না রমণীদেহের লাবণ্যের মত। শুধু অবয়ব সুন্দর হলেই হবে না, তাতে অলঙ্করণের প্রাচুর্য থাকলেই চলবে না, তারও বেশী কিছু চাই।

প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাষু
—ধ্বন্যালোক

সেদিন তাঁরা যা বলে গেছেন কবিতা সম্বন্ধে তার চেয়ে বড় কথা পূর্ব-পশ্চিমের কোথাও আর শোনা গেছে বলে ত জানি না।

কাব্যের আসল যা সত্য তা চিরন্তন হলেও, তার রীতি প্রকৃতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই পরিবর্তন মানেই প্রগতি, যা আধুনিক তা প্রাচীন কালের নিদর্শন থেকে স্বতন্ত্র শুধু নয় শ্রেষ্ঠতর, এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা

আর বুঝি কিছু হতে পারে না। আমাদের মন সাধারণতঃ উপমা ধরেই চলে। কালের যাত্রাকে আমরা নদীর স্রোতের ছবি দিয়েই বুঝি। এ বোঝায় দোষ কিছু নেই। কিন্তু এই উপমা যুক্তি হয়ে দাঁড়ালেই ভ্রান্তি। বিশেষ করে শিল্প সাহিত্যের বেলায়। গত দু শতাব্দীর বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের জয়যাত্রাই আমাদের আরো একটু বিভ্রান্ত করে রেখেছে। অতীতে যা ছিল তার চেয়ে আধুনিক কালের বিজ্ঞানের অগ্রগতির কোন তুলনা পর্যন্ত চলে না। কিন্তু বিজ্ঞানের এই নজীর শিল্প সাহিত্যের বেলা খাটে না। সময়ের গতি দিয়ে শিল্প সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার অচল। শিল্প সাহিত্য হয় চরম পূর্ণতায় পৌঁছোয়, নয় পৌঁছায় না, তা কাল-নির্ভরও নয়। এ যুগের পিকাসো যত বড়ই শিল্পী হন না কেন, শুধু কালের দিক থেকে পরে জন্মেছেন বলে অজন্তার চিত্র তাঁর ছবির কাছে নস্যাৎ হয়ে যায়নি। পিরান্দেলো এযুগের নাট্যকার বলে কালিদাস কি সেক্সপীয়রের চেয়ে বড় নন। সময়ের আগুপিছু এখানে ধর্তব্যই নয়। শিল্প সাহিত্যের অমর স্বর্গলোক কালাতীত। অতীতের অন্ধ অনুকরণও তাই যেমন নিন্দনীয়, আধুনিকতার নামে যে কোন হুজুগের ঢেউই তেমনি প্রগতির সামিল নয়।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্প সাহিত্য নতুন প্রকাশ-বৈচিত্র্য খুঁজবে একথা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সে খোঁজাও সত্য হলে ধারাবাহিক হতে বাধ্য। নতুনত্বের নামে যে কোন বাতুলতাই এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ নয়।

সব কিছুর মত সাহিত্যেও হুজুগের ঢেউ আসে। আমাদের

কাব্যে বিদেশ থেকে সেই ঢেউ কিছুকাল আগে এসেছিল। বিদেশের প্রভাব প্রেরণা মাত্রেই দোষের নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের দেশের বর্তমান সাহিত্যের মূলে বিদেশের প্রেরণা অনেকখানিই আছে। শুধু ভৌগোলিক গণ্ডি দিয়ে সাহিত্যের সীমা নির্ণয় বর্তমানকালে চলে না, কোনকালেই চলত কি না সন্দেহ। যা সত্যকার সাহিত্য তা সর্বকালীন সর্বজনীন। কিন্তু সাময়িক বিকার বিশৃঙ্খলা সব দেশের সাহিত্যেই মাঝে মাঝে দেখা দেয়। বিদেশের সুস্থ প্রেরণাকে বাদ দিয়ে বিকারের ছোঁয়াচটুকুই যখন গ্রহণ করি তখন সেটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে। নিছক নতুনের নেশায় বিচার-বুদ্ধি যাঁদের আচ্ছন্ন নয়, হুজুগের স্রোতকে ঠেকাতে ধ্রুব শিল্প সত্যের ওপর দৃঢ়পদে এগিয়ে নয়, পিছিয়ে দাঁড়াবার সাহসই তাঁদের দরকার।

সত্যিকার এগিয়ে যাওয়ার জন্যে পিছিয়ে আসারও যে কখনও কখনও দরকার হয় একথাও আমাদের স্মরণ না রাখলে নয়। আনন্দের বিষয় এই যে বাংলার বর্তমান কাব্য জগতের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় সাময়িক বিকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সুস্থ বলিষ্ঠ কাব্যাদর্শকে ধরে থাকবার সাহসের অভাব সেখানে ঘটেনি। বিশেষ কারুর নাম করবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এখন যে সব তরুণ কবির কণ্ঠ আমরা শুনতে পাচ্ছি, সাম্প্রতিক সংক্রামক বিকারের কোন লক্ষণ তাঁদের মধ্যে নেই—বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ তাঁদের ভেতর দিয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে বলে আমরা অকুণ্ঠিতভাবে গর্ব করতে পারি।

পরিশেষে কবিদের মহৎ দায়িত্বের কথা একটু শুধু স্মরণ করতে চাই। বিজ্ঞানমদমত্ত রাজনীতির আবর্তফেনিল এ যুগে কবিরা হয়ত সাধারণ ঔদাসীন্যের আবহাওয়ায় নিজেদের মূল্য সম্বন্ধেই একটু সন্দিহান হতে সুরু করেছেন। কিন্তু যুগ বা দেশ উদাসীন বলেই কবির দায়িত্ব আরো বেশী কঠিন। কবির মূল্য অন্য কোথাও না হোক আমাদের এ দেশে আদিকাল থেকে সকৃতজ্ঞভাবে স্বীকৃত। এদেশের প্রাচীনতম সাহিত্যে কবি ও ঋষি সমার্থবাচক, কবিকে সেখানে বলা হয়েছে ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ যাঁর দৃষ্টিতে অতীত ও অনাগত সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট সব কিছুই সমানভাবে উদ্ভাসিত। কাব্যের উপাদানও তাঁরা অশেষ বলে জেনেছিলেন,

> ন তচ্ছিল্পং ন তচ্ছাস্ত্রং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
> জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান কবেঃ ॥

অর্থাৎ—এমন কোন শিল্প বা শাস্ত্র, বা বিদ্যা বা কলা নেই যা কাব্যের উপাদান নয়,—কি গুরুভারই না কবিকে বইতে হয়।

পৃথিবী যদি সাময়িক উত্তেজনায় উদাসীনও হয় তবু কবিকে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। মানুষের মনে সুর লাগানো তাঁদের কাজ কিন্তু সেই সঙ্গে যুগে যুগে মানবতার গভীর মর্মোদ্ঘাটন করে জীবন-সত্য ভুলতে না দেওয়াও তাঁদের দায়িত্ব। শেলী বলেছিলেন "Poets are the unacknowledged legislators of mankind"—কবির অতিশয়োক্তি কি মিথ্যা দম্ভ বলে একথা উড়িয়ে দেওয়া বুঝি

যায় না। যুগের মানুষ নানা কারণে উদ্ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু কবিকে তাঁর লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। কারণ জীবনের পরম রহস্যের চাবি শুধু বুঝি তাঁর কাছেই।*

* আমেদাবাদ কবিসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

বোম্বাই

প্লেনে পাঁচ ঘণ্টা। ট্রেনে ছত্রিশ। টিকিটে লেখা বারোশ বারো না তেরো মাইল। কলকাতা বোম্বাই-এর তফাৎ দূরত্বের মাপে ওই। কিন্তু তফাৎ কি শুধু ভৌগোলিক দূরত্বে ?

দূরত্ব আরো অনেক কিছুতে নিশ্চয়।

বোম্বাই থেকে ফিরলে কলকাতার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেন, 'কি দেখলে সেখানে ?'

কলকাতা থেকে বোম্বাই গেলে সেখানকার বন্ধুরা শুধান, 'কি খবর কলকাতার ?'

বলা বাহুল্য দু' জায়গার বন্ধুরাই সিনেমার জগৎ সম্বন্ধেই বিশেষ কৌতূহলী।

মাদ্রাজ খাতার পাতে উঠেছে কিন্তু জাতে এখনও ওঠেনি। কলকাতা বোম্বাই এখনো সমাজ-শিরোমণি। কলকাতার প্রতিপত্তিই আছে পয়সা নেই। বোম্বাই এর প্রতিপত্তি যা আছে তা পয়সার দিক দিয়েই।

কিন্তু কলকাতা বোম্বাই-এর বৈশিষ্ট্য বিচার করতে শুধু সিনেমার জগতের কথাই আসে না।

সিনেমার জগৎ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই বোম্বাই বিস্ময় যতটা জাগায় তার চেয়ে বেশী অস্বস্তি। এই অস্বস্তিটা কিসের বুঝতে সময় লাগে। কিন্তু বুঝতে পারলে বোম্বাইকেও বোঝা হয়ে যায়।

এ অস্বস্তি ঠিক বিদেশের অপরিচয়ের নয়। কলকাতার লোকের কাছে অপরিচিত ত অনেক শহরই হতে পারে—দিল্লী, আগ্রা, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ। কিন্তু সে সব শহরে বোম্বাই-এর মত এমন একটা অনুভূতি বোধ হয় আসে না, অন্ততঃ আমার ত নয়।

শহর হিসেবে বোম্বাই-এর অনেক কিছুই আছে তারিফ করবার। সমুদ্র পাহাড়ের পটভূমিকার যন্ত্রজয়ী মানুষের ঐশ্বর্যের এমন জয়যাত্রা ভারতবর্ষের আর কোন শহরে দেখা যাবে! পূর্ব-পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের বিচিত্র বিভিন্ন মানুষের এমন সমাবেশ!

শত গজ বিস্তৃত বাসের কিউ-এ সুদীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সর্বজাতি সম্মিলনের এই অপূর্বত্ব হৃদয়ঙ্গম না করে উপায় নেই। ডানপাশের লোকটি হয়ত গুজরাটি, বাঁ-পাশের মহিলাটি পার্শি তার পরের লোকটি গোয়ান তার পরেই হয়ত পাঞ্জাবী শিখ মারাঠি কি তেলেগুভাষী অন্ধ্র। ভারতের ছত্রিশ কোটির ছত্রিশ জাতির প্রতিনিধিই সে কিউ-এ উপস্থিত। তাদের পোষাক আলাদা, ভাষা আলাদা চেহারা চরিত্র ত বটেই। কিন্তু তবু তারা কোথায় যেন এক। তাদের সে একত্ব ভারতবাসী হওয়ার অভেদত্ব নয়। যেমন তাদের জনতা নয় একতা। তাদের একত্ব কিউ-এর। সবাই তারা 'কিউ'-এর মানুষ, তাই এক। কিউ-এর দেশ বোম্বাই।

বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরেই প্রথম চমক লাগে বিশ্রী বিশৃঙ্খলা দেখে বাংলার প্রধান শহরের। বাসে

ঠাসাঠাসি ট্রামে ঠেলাঠেলি। শহুরে হিসেবে যথেষ্ট সভ্য আমরা এখনো হইনি। শৃঙ্খলা জানিনা যথোচিত।

কিন্তু তবু একের জুতো থেকে পা বাঁচাতে আর এক ভদ্রলোকের পা মাড়িয়ে অর্ধেক ঝুলন্ত অবস্থায় বিচিত্র দোল খেতে খেতে যেতেও মনটা বোম্বাই-এর মত ঝিমিয়ে না পড়ে চাঙ্গা থাকে কিসে? বোধহয় বাঙালীর জাতীয় স্বভাবের দোষে। ভালো মন্দ কোন বাঁধনই আমাদের ধাতে সয় না। নিয়ম দেখলেই ঘাড় বাঁকে।

মস্ত দোষ সন্দেহ নেই। এই স্বভাবের দোষের খেসারৎও দিচ্ছি সর্বত্র। কিন্তু শোধরাতে হলে মামুলি ওষুধে কাজ হবার নয়। নিয়ম শুধু মানবার জন্যেই নয়, ভাঙবার জন্যেও কখনো কখনো। এ কথা আমাদের পাখীপড়া করেও ভোলান যাবেনা বোধ হয়। যদি কখনো যায় তাহলে আমাদের সুখ সম্পদের সীমা থাকবেনা বোধহয়। কিন্তু বাঙালী থাকব কি?

সব জাত সব দেশ সম্বন্ধেই নাক সিটকানো উগ্র উৎকট বাঙালীত্বের ওকালতি করছি না। ও সঙ্কীর্ণতার নাম বাঙালীত্ব নয়। কিন্তু বাংলা দেশের নিজস্ব একটা চেহারা চরিত্র আছে। আছে অন্য প্রদেশেরও! থাকা দরকার। এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ঐক্যতানই জাতীয়তা। ভারতবাসী হওয়া মানে এক মাপে কাটা ছাঁটা কলের পাইকারি মাল নয়।

শহর মানুষেরই প্রতিবিম্ব,—অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের সংগ্রাম আর ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষার। যেখানে যে শহরেই যাই সেখানকার মানুষের চরিত্র সংস্কৃতি ও ইতিহাসের

ছায়া ও ছাপ কিছুটা তার মধ্যে পাওয়া যায়। তাকেই বলি শহরের প্রাণরূপ।

মন গোড়াতেই বিমুখ ছিল বলে কি না জানিনা, বোম্বাই-এ সেই প্রাণরূপের সন্ধান কোথাও পেলাম না।

ইতিহাস বোম্বাই-এরও আছে। মামুলি ইতিহাস নয়। বেশ রঙীন।

সমুদ্রের ধারে ক-টা বিচ্ছিন্ন শ্রীহীন্ পাথুরে দ্বীপ। সেখানে কোন আদ্যিকাল থেকে 'কোলি' নামে এক ধীবর জাতির বাস। ডাঙায় নোনা পাহাড়ে-মাটির নারকেল আর খেজুর বনের মধ্যে পাতায় ছাওয়া ঝুপড়ি বেঁধে অতি দীনের মত তারা থাকে, আর তাদের মোচার খোলার মত নৌকোয় দেবতার দুঃসাহস নিয়ে সমুদ্রের ফসল তুলতে বেরোয়।

কবে বৌদ্ধধর্মের সুদূর প্রসারী অভিযান তাদেরই প্রতিবেশী পাহাড়ে নিজের পদচিহ্ন রেখে গেছে তারা জানে না। কবে আশ্চর্য এক শিল্পীর জাত ছোট্ট একটি দ্বীপকে অতুলনীয় ভাস্কর্যের তীর্থ গড়ে তুলে লুপ্ত হয়ে গেছে তারা খোঁজ রাখে না।

দিগন্তে মোগল শাসনের উদ্যত তর্জনী, কিন্তু নিঃস্ব নিঃসম্বল জেলেদের এই দরিদ্র দ্বীপ ক-টি পর্যন্ত তা প্রসারিত করবার মজুরি পোষায় না।

প্রথম হানা দিল বুঝি বেপরোয়া পর্তুগীজ বোম্বেটে পাকা পোক্ত আস্তানা গাড়তে। সেদিনের পালতোলা জাহাজের পক্ষেও এমন একটি নিরালা নিরাপদ বন্দর পাওয়া সহজ ছিল না। সে দুরন্ত পর্তুগীজ প্রতাপও নবজাগ্রত

মারাঠা রাজশক্তির সামনে যখন লেজ গুটোতে সুরু করেছে তখন ইতিহাসের পাতা ওল্টালো সামান্য একটা বিয়ের ব্যাপারে। অবশ্য রাজ রাজড়ার বিয়ে। পর্তুগাল ও ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের বিবাহ বন্ধনের ব্যাপারে যৌতুক হিসেবে বোম্বাই এল ইংলণ্ডের দখলে। রাজ জামাতার যৌতুক গেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে।

তখন থেকেই সদাগরীর যুগ সুরু।

বড় মজার কথা এই যে বোম্বাইএর সত্যিকার পৌষমাস এসেছিল আমেরিকার সর্বনাশে। তখন আমেরিকার উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে যুদ্ধ চলেছে দাসত্ব বিলোপের প্রশ্ন নিয়ে। দক্ষিণের তুলো মাঠেই পচছে চালানের অভাবে। বোম্বাই ছনিয়ার তুলোর বাজারের পাকা দখল পেয়ে গেল সেই সুযোগে। ফেঁপে উঠল, ফুলে উঠল সেই তুলোতেই।

তুলোর ফাঁপ বোম্বাইএর একেবারে গোড়াতেও।

যে যুদ্ধের কথা বললাম তারও প্রায় একশ বছর আগে, বোম্বাইএর আধুনিক বন্দরের সবে যখন পত্তন হয়েছে তখনও এই তুলোই বোম্বাইকে তুলেছে। চীনের সঙ্গে তুলোর কারবারেই সেদিন বোম্বাইএর সৌভাগ্যের সূচনা।

বোম্বাই তুলোয় ফাঁপল আর সেই সঙ্গে বরাত ফিরল হরেক জায়গায় হরেক জাতের বেনে বুদ্ধির মক্ষিকার।

বেদের আর্যেরা যে জ্ঞাতি-শত্রুদের গাল না দিয়ে জল গ্রহণ করতেন না, সমুদ্র-মন্থনে ঠকানো সেই আদি-অসুরদেরই কজন বংশধর ধর্মনাশের ভয়ে অনির্বাণ বিশ্বাসের অগ্নিশিখা বুকে আগলে মরু পাহাড় ডিঙিয়ে এই ভারতবর্ষেই

আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। কাথিয়াওয়াড়ের ঊষর উপকূলে কোনরকমে তখন তাঁদের দিন কাটছে।

বোম্বাইএর উত্থানের সঙ্গেই তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘুরল। সমুদ্র মন্থনে যদি সত্যিই তাঁরা ফাঁকি পড়ে থাকেন, তাহলে সে ফাঁকির শোধ ভালো করেই তাঁদের মিলল এতদিন বাদে। মিলল সমুদ্র থেকেই।

বোম্বাই-এর সমুদ্র মন্থনের সুধার প্রধান অংশিদার বলা যায় আদি-অসুর-কুলোদ্ভব পার্শি সম্প্রদায়কে। তা ছাড়া গুজরাত মারোয়াড়ের বণিক ত বটেই, সুদূর মধ্য-প্রাচ্যের আরব আর্মানী বোগদাদী ইহুদীও বাদ যায়নি।

কিন্তু এ সমুদ্র-মন্থনের সুধা শুধু যোগ বিয়োগের অঙ্কের, শুধু সুদে খাটাবার সওদার।

দূর দূরান্তর থেকে সে সওদার লোভে যারা এসেছে বোম্বাই তাদের কাছে মুনাফা মারবার হাট মাত্র, মন বাঁধবার ঘাট নয়। তারা ডেরা বেঁধেছে, হয়ত বাঁধাও পড়ে আছে, কিন্তু ভিৎ গাড়তে পারেনি হৃদয়ের। তা যদি পারত তাহলে দিগন্ত-ছোঁয়া সমুদ্রের কোলে মেরিন ড্রাইভের ওই সব চক্ষুশূল উঁচিয়ে ধরবার আগে লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে যেত।

কিন্তু সওদাগরী শহর বোম্বাই। মাথা হেঁট নিয়ে কোন দুর্ভাবনার ধার ধারে না। মাথা তার লাভ লোকসানের হিসাবের খাতায় হেঁট-ত হয়েই আছে সারাক্ষণ।

এ শহরে মানুষ বাসা বাঁধে কিন্তু স্বার্থ ছাড়া তাকে ভালবাসে বলে বিশ্বাস হয় না।

ইলেকট্রিক ট্রেনে যারা কলের পুতুলের মত যায় আসে, বাসের কিউ-এ ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মত যারা দাঁড়িয়ে থাকে, চৌপাঠির ময়লা বালির সঙ্কীর্ণ সৈকতে গায়ে-গা-ঠেকা ভীড়ে নিষ্প্রভ পথ হারা দৃষ্টি নিয়ে যারা নির্জনতা খুঁজতে আসে, মেরিন ড্রাইভের সাগর-প্রাচীরে সমুদ্রের দিকে পিঠ ফিরিয়ে যারা প্রতি সন্ধ্যায় স্বাস্থ্যোন্নতি করতে বসে থাকে, জুহুর সমুদ্রতীরে ভীড় করে যারা নিস্তেজ ঢেউ-এ পা ভিজাতে যায়, সবাই তারা আদমস্থুমারীর দপ্তরে বোম্বাই-এর বাসিন্দা। কিন্তু সত্যিকারের আপনার বলতে বোম্বাই-এর কেউ আছে কিনা সন্দেহ! বোম্বাইও তাই বুঝি কারুর নয়।

ব্যাপারীর সওদার মত কিনতে যে পারে, সে তার। আর নগদ দাম দিয়ে যে কেনে, হৃদয় দিয়ে পাওয়ার কোন মানেই তার কাছে নেই।

হৃদয় তাকে কেউ দেয়নি বলেই বোধহয় বোম্বের হৃদয় গড়ে ওঠেনি। হৃদয়ের জায়গাটা তার কেনা বেচার কায়দা-কানুনেই বুঝি ঠাসা।

কেনা বেচার চাকায় সারা দুনিয়ায় সভ্যতাই ত আজ বাঁধা। কোথাও কম, কোথাও বেশী। কেনা বেচার বাইরে তবু কিছু থাকে। সেইটুকুই শহরেব প্রাণাধার।

কিন্তু বোম্বই-এ পা দিলেই যেন বিক্রী হতে এসেছি বলে যদি মনে হয় সে কি আমার ব্যক্তিগত মনের বিভ্রম?

তাইতেই বোধহয় ভুলতে পারি না যে, বোম্বাই-এ ঢুকতে সুড়ঙ্গ, বেরুতেও তাই।

সে সুড়ঙ্গ যদি এড়াতে হয় তাহলে চড়াই ভাঙতে হবে দুরারোহ পশ্চিম গিরি-প্রাচীরের।

ভারতবর্ষের সমতল বোম্বাই-এর অনেক ওপরে এই এক ভরসা।

বোম্বাই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করা উচিত।

তবু……

তবু একটু খোঁচা মনের কোথায় যেন বেঁধে।

আর কিছুই কি নেই বলবার? হ্যাঁ আছে।

মালাবার হিল্‌সের এক হোটেলের ছাদ থেকে অন্ধকার এক রাত্রে আলোর ফোঁটায় আঁকা চৌপাঠি থেকে কোলাবা পয়েণ্ট পর্যন্ত সুদূর অন্ধকার দিগন্তের পানে যে জ্বলন্ত অঙ্গুলি নির্দেশ দেখেছিলাম, তার কথা না বললে নয়।

ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের পাথুরে তীরে দাঁড়িয়ে দেখেছি মেঘলা সন্ধ্যার সীসা-মলিন সমুদ্রে জেলে নৌকোর অগুণতি শাদা পাল ভীরু স্বপ্ন-সাধের মত ছড়ানো।

নির্জন শান্ত স্তব্ধ মাউণ্ট-মেরীর মন্দিরেও একদিন গিয়ে দাঁড়িয়েছি। চারশ না পাঁচশ বছর আগে সমুদ্রগর্ভ থেকে কোন ভাগ্যবান জেলের মাছ-ধরা জালে তিনি ধরা দিয়েছিলেন। ক্যাথলিকদের দেবী। কিন্তু জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বোম্বাই তাঁর পাদপীঠ তলে শ্রদ্ধার বর্তিকা জ্বেলে দিয়ে যায়। সেই মোমবাতির মৃদু কম্পিত আলোকে উত্তাপে হঠাৎ উচ্ছ্বাসে আমার হৃদয় গলে যায়নি সত্য, কোন ভক্তির উৎসও আমার উথলে ওঠেনি, কিন্তু বহুবিচিত্রের সম্মিলিত এই আন্তরিকতার দ্যুতিতে ক্ষণিক সংশয় জেগেছে নিজের

ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তি সংস্কার নিয়ে একটা নগরের এত বড় বিচার সেরে ফেলবার অধিকার সম্বন্ধে।

মনে হয়েছে এত কঠোর, এত অধীর হবার বুঝি কিছু নেই।

স্বার্থ যাদের মিলিয়েছে প্রীতিতে তারা একদিন বাঁধা পড়বেনা কে বলতে পারে?

বোম্বাইকে অহেতুক প্রেমে ভালবেসে যে হৃদয় দান করবে, সেই ভাবী কবিকে হয়ত কোলাবার ক্যজওয়ের ওপর আনমনে বসে থাকতে দেখেছি কোনদিন। দেখেও চিনতে পারিনি।

কোথায় সে তার স্বপ্নের রঙ গুলছে জানিনা।

এইটুকু শুধু জানি যে সিনেমার কোন স্টুডিওতে তাকে দেখিনি।

উপন্যাস প্রসঙ্গে

উপন্যাস নাকি মুমূর্ষু। ঠিক শ্বাস না উঠলেও তার শেষ দশার অনেক লক্ষণ নাকি স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে বলে সাহিত্য জগতে একটা আশঙ্কা জেগেছে কিছুকাল।

সারা দুনিয়া ত বটেই আমাদের দেশেও সাময়িক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের সাক্ষ্য তা অন্তত বলে না। পাঠাগারের তাকের পর তাক বেড়েই চলেছে। ছাপাখানারা ছেপে কুল পাচ্ছে না। উপন্যাসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে ফেলছে বর্ষার প্রশ্রয়ে নবতৃণাঙ্কুরের মত কি!

অর্থাৎ বাইরে থেকে দেখে উপন্যাস সম্বন্ধে হতাশ হবার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বাইরের সাক্ষ্যটাই নাকি সব নয়। সংখ্যার প্রাচুর্য দিয়ে তার প্রাণ-শক্তির বিচার চলে না আর সংখ্যাধিক্যও যা দেখা যায় তাও নাকি সঠিক নয়। উপন্যাস অনেক বেরুচ্ছে কিন্তু দু একটি বাদে তার অধিকাংশেরই পরমায়ু অত্যন্ত ক্ষীণ, প্রসার ও সঙ্কীর্ণ। জনপ্রিয়তায় পর্যন্ত উপন্যাসের জায়গা ক্রমশ স্মৃতি-কথাজাতীয় কাহিনী দখল করে নিচ্ছে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় যার ভিত্তি।

উপন্যাসের এই অধোগতির ধারনা সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও কিছু সত্য এর মধ্যে বোধহয় আছে। অন্তত উপন্যাসের স্বর্ণযুগের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত বর্তমানকালে উপন্যাসের

ধারার দিকে চেয়ে তাঁরা যদি তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু সন্দিগ্ধ হন তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

উপন্যাসের স্বর্ণযুগ প্রথম মহাযুদ্ধের আগের একশ বছর বলে বোধহয় ধরা যায়। উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে যাঁরা দিকপাল তাঁদের অধিকাংশই ওই সময়ের মানুষ। আধুনিক উপন্যাস বলতে যা বুঝি তার রূপ তাঁরাই সম্পূর্ণ ও সার্থক করে তুলেছিলেন।

তার আগে উপন্যাসের উৎস খুঁজতে গেলে অবশ্য আদি-কালের মহাকাব্যগুলিতেই আমাদের পৌঁছোতে হয়। রামায়ণ কি মহাভারত, ইলিয়াড কি ওডিসি ছন্দোময় কবিতায় লেখা হলেও আসলে মানুষের কাহিনীর যে বিরাট সমগ্রতাকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করেছে, এ যুগের উপন্যাসের মূল ধ্যানের বস্তুও তাই।

গল্পের ক্ষুধা মেটাবার জন্যেই উপন্যাসের জন্ম কিন্তু সেই ফরমাশটুকু খেটেই তার স্রষ্টারা তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। সাধ মেটানো গল্প বলতে গিয়ে তাঁরা জীবনের অগাধ রহস্যের মুখোমুখি হয়েছেন। আর সেই সাক্ষাতের বিস্ময় তাঁদের কাহিনীকে ইচ্ছা পুরণের তুচ্ছ সীমা ছাড়িয়ে সন্ধান ও উপলব্ধির আর এক অতলতায় নিয়ে গেছে।

সত্যিকার উপন্যাসের কাছে তাই আমরা এমন কিছু পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে মানুষের ভাষার মারফৎ আর কোথাও কেউ দিতে পারে নি—না ধর্ম কি রাজনীতি, না দর্শন কি বিজ্ঞান। পেয়েছি মানুষের জীবনের সেই দুর্জ্ঞেয় তরঙ্গ-দোলার চির-অস্থির বিন্যাস, কোনো সূত্র দিয়ে যাকে সংক্ষিপ্ত

করা অসম্ভব, কোনো সীমা টেনে যার শেষ কথা বলা যায় না। জীবন যেখানে নিজের আলোয় নিজেকে খুঁজছে আর নিজের ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে,—পেয়েছি, বোঝা না বোঝার সেই অস্থিরতা ও অন্তহীন আকুলতা। মহৎ উপন্যাস তাই শুধু তথ্য নয়, তত্ত্ব নয়, কল্পনার অলস বিলাস ত নয়ই, তা সমস্ত মানুষের আত্মসন্ধানের অভিযান, উল্লাস ও হতাশা, বিস্ময় ও উত্তেজনা যার মধ্যে একাকার হয়ে আছে।

উপন্যাসের সুবর্ণ যুগে সেই সব আশ্চর্য সৃষ্টি আমরা পেয়েছি বিশেষ যুগের ও দেশের পটভূমিকায় মানুষের চিরন্তন রহস্যের সঙ্কেতদীপ্তি যেখানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সাধারণ ঔপন্যাসিক অবশ্য দেশকালের বন্ধনে বাঁধা। জীবন-জিজ্ঞাসা যত আন্তরিকই হোক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বদ্ধমূল কিছু ধারণার খুঁটিতে মন তার গোড়া থেকে বাঁধাই থাকে। বর্তমান দিনের বেড়া ডিঙিয়ে আগামীকালের ইঙ্গিত সম্পূর্ণভাবে তার কাছে পৌঁছোয় না। এ সব উপন্যাসের সাময়িক মূল্য অবশ্যই আছে। গল্পের ক্ষুধা মেটানো ছাড়াও সমকালীন সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ককে যতটুকু যথাযথভাবে তা প্রতিফলিত করে রাখে ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে তা দামী। 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস'-এর মত উপন্যাস সে যুগের পাঠকের মনোরঞ্জন করার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে, ও হয়ত ঔপন্যাসিকের নিজের অজ্ঞাতসারেই তখনকার বিলাতী সমাজের একটি সামাজিক সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। তখনকার যে উপন্যাসটি

আজ পর্যন্ত শতাধিক বৎসর সমানভাবে জনপ্রিয় হ'য়ে আছে, সেই 'জেন আয়ার'-এর আবেদন মূলতঃ প্রেমের হলেও, আধুনিক যুগ মেয়েদের যে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি দিতে অগ্রসর, হৃদয়ের ক্ষেত্রে তার প্রথম আভাসই বোধহয় তার সুদীর্ঘ পরমায়ুর প্রধান কারণ।

কিন্তু এ সব উপন্যাস যত দীর্ঘকাল ধরেই তৃপ্তি দিক, সময়ের ছায়া তার মধ্যে যত স্পষ্টভাবেই পড়ুক, জীবনকে সমগ্রভাবে বোঝবার ব্যাকুলতা তার প্রধান প্রেরণা নয়। উপন্যাসের স্বর্ণযুগ যাঁরা সার্থক করেছেন, তাঁদের জাতই তাই আলাদা। তাঁরাও মানুষকে গল্প শোনাতেই বসেন, সে গল্পে আমাদের মনোহরণের উপাদানও কিছু কম থাকে না, কিন্তু তবু সে গল্প শুধু কম-বেশী ক-টি চরিত্রের সুখ-দুঃখের লীলায় আমাদের মুগ্ধ করেই ছুটি নেয় না। যুগের ছায়া যথাযথভাবে তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েও যুগাতীত কিছু জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধি তার মধ্যে মিশে থাকে।

টলস্টয় তাঁর 'ওয়ার এণ্ড পীস'-এ উপন্যাসবর্ণিত কালের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন, তার তুলনা মেলে না। তাঁর আশ্চর্য তুলিতে তুচ্ছ থেকে বিরাট সব কিছু নিয়ে সে যুগকে এমন জীবন্ত তিনি করে তুলেছেন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরও যা সাধ্যাতীত। কিন্তু 'ওয়ার এণ্ড পীস' তা সত্ত্বেও শুধু নেপোলিয়নের আক্রমণের যুগের রাশিয়ার গল্প নয়। তা সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষের মানে বোঝা ও খোঁজার কাহিনী। সে কাহিনীর বিবরণ-বাহুল্য হয়ত আজ আমাদের তেমন আকর্ষণ না করতে পারে কিন্তু মানুষের

জীবনধর্মকে যাদের ভেতর দিয়ে তিনি মূর্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন সেই পিয়ের আর নাটাশা আমাদের চিরদিনের সহচর হয়ে রইল।

একা টলস্টয় নয়, জীবনেয় ভাষায় জীবনের কথা যাঁরা বলেছেন পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোন ভাষায় সেই সমস্ত ঔপন্যাসিক পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে অত্যন্ত পৃথক হয়েও একটি বিষয়ে সমধর্মী। জীবনের ছবি আঁকবার ছলে তাঁরা মানবতার মর্ম সন্ধান করে গিয়েছেন। ডিকেন্সের মত ঈষৎ স্থূল কৌতুকের কণ্ঠেই হোক কি আনাতোল ফাঁসের অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরেই হোক, ডষ্টয়েভস্কির মত গাঢ় গভীর প্রাণের মমতা দিয়ে হোক, কি গর্কির মত আপাতঃনির্লিপ্ত বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা নিয়েই হোক, মানবজীবনকে তার দুর্জ্ঞেয়রহস্যের সমগ্রতার তাঁরা ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের কাহিনীর যে কোন দিনের বিবরণের পেছনে ইতিহাসের অলক্ষ্য স্রোত প্রবহমান, তুচ্ছতম যে কোন চরিত্রের মধ্যে মানবতার চিরন্তন গহন বিস্ময়।

গত যুগের মহারথীদের হাতে উপন্যাস তাই অবসরবিনোদনের সামগ্রীর বদলে ইতিহাস-বিবর্তনের জীবন্ত উপকরণ হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক যা বুঝতে অক্ষম, বৈজ্ঞানিক তার বিশ্লেষণে যার নাগাল পায় না, দার্শনিক তার সমীকরণে যা হারায় সেই দুর্লভ দুরধিগম জীবনবোধ এই উপন্যাসিকরা আমাদের দিয়েছেন। জীবনের ছায়া শুধু সাহিত্যে পড়েনি, সাহিত্যের স্রোত জীবনকে নতুন চেতনার উপকূলে পৌঁছে দেবার তরঙ্গ তুলছে।

সাহিত্যের সেই বিরাট-পুরুষেরা বিদায় নেবার পর এ রাজ্য এবার শুধু বালখিল্যেই ছেয়ে যাবে অনেকে এই আশঙ্কা করছেন। বর্তমান সাহিত্যজগতের দিকে চাইলে সেরকম সন্দেহ একটু যে জাগে না এমন নয়। ভীষ্মদ্রোণ না থাকলেও কৃপ কর্ণ এখনও অবশ্য বর্তমান। কিন্তু অস্তসূর্য তাঁদের ছায়াটাও যেন ক্রমশ দীর্ঘতর করে তুলছে। উপন্যাস যেন নিজের শক্তিতে নিজেই বিশ্বাস হারিয়েছে। বিদেশে দেখেছি ক্রমশই আদি রসের নালার দিকে পা বাড়িয়ে কুরুচির সস্তা সাজে সেজে উপন্যাস শুধু ইতরজনের হাটেই বিকোবার জন্যে ব্যাকুল। বর্তমানকে স্পষ্ট করে দেখবার মত চোখের জোরটুকু যাদের নেই, তাদেরই অনেকে অতীতের দিকে নকল দূরবীণ লাগিয়ে দুর্বল কল্পনার কাঁচা রঙ ইতিহাসের গায়ে বেপরোয়া লেপে দিচ্ছে।

উপন্যাস যদি ক্রমশঃ এই সব অর্বাচীনদেরই একচেটে হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ অবশ্যই অন্ধকার বলতে হবে। দুদণ্ডের তামাসার বেশী কোন দাম তার থাকবে না। ছায়া-ছবির ঝলমলানি তাকে অদৃশ্য করে দেবে। বেতারের কাছেও তাকে ক্রমশ নীরব হতে হবে। আর 'টেলিভিসন' ত তার পাত্তাড়িটুকুও গুটিয়ে ছাড়বে একদিন। বড় জোর আজকের দিনের পুতুলনাচ বা পাঁচালীর মত সংস্কৃতির যাদুঘরের এক কোণে তার একটা সম্মানের জায়গা হয়ত থাকতে পারে।

ভরসার কথা এই যে, বিকারের লক্ষণ নানা জায়গায় একটু বেশী চোখে পড়লেও সুস্থ বলিষ্ঠতা একেবারে বিদায় নেয় নি। ঠগের প্রাদুর্ভাব একটু বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু

তাদের বাছতে গাঁ উজাড় হবার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। জানা অজানা বহু কারণে মানুষের চিত্তভূমি ইদানীং বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত ও অনুর্বর হওয়ার দরুণ আগাছার বাড় বাড়লেও বনস্পতি একেবারে বিরল নয়। অন্ততঃ তার বীজ যে মরেনি তার প্রমাণের অভাব নেই।

বিদেশের কথা যতটুকু জানি বা না জানি, ধৃষ্টতার মত শোনালেও না বলে পারি না যে, বাংলা ভাষায় অন্ততঃ উপন্যাস সম্বন্ধে হতাশ হবার কোনো কারণ ঘটেনি। সাময়িক কোনো কোনো রোগের ছোঁয়াচ এখানেও কোথাও কোথাও হয়ত কিছুটা লেগেছে, কিন্তু তা ব্যাপক বা মারাত্মক নয়। এরণ্ডকেই মহীরুহ ভাববার অন্তত এখনো এখানে দরকার নেই, কারণ বনস্পতির বীজ প্রাণশক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়নি।

বাংলার মনের মাটি অতি সরস ও কোমল বলে, এখানে উপন্যাসের দৃঢ় বিশালতার উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাব আছে, এইরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা যদি কোথাও থাকে তা বার বার বহু বিরুদ্ধ প্রমাণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়েছে। আনন্দমঠ স্বর্ণলতা থেকে শুরু করে চোখের বালি, গোরা চতুরঙ্গ যোগাযোগ চার অধ্যায় ল্যাবরেটরীতে তার যে বিস্ময়কর বৃদ্ধি ও বিস্তার দেখেছি, পল্লীসমাজ ও শেষ প্রশ্ন ছাড়িয়েও তার বলিষ্ঠ বেগ ক্ষুন্ন হয়নি। পথিক ও মহাযুদ্ধের ইতিহাসের পর পথের পাঁচালি ও আরণ্যকের মত সৃষ্টি বাংলা ভাষার গৌরব বাড়িয়েছে। পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসকে অজানা নতুন গভীরতায় যেমন নিয়ে গেছে, সেই

সঙ্গে মৃগয়া কি সত্যাসত্যে ভঙ্গি ও বক্তব্য নিয়ে সার্থক পরীক্ষা উপন্যাসের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে এবং একেবারে বর্তমান বৎসর পর্যন্ত, সাহেব বিবি গোলাম, উপনিবেশ, কাঞ্চন মূল্য, লালবাঈ, চেনামহল, কলকাতার কাছেই, কিন্তু গোয়ালের গলি, আকাশ পাতাল, জলে জঙ্গলে, বি টি রোডের ধারে, নীলাঞ্জন, ইস্পাতের স্বাক্ষর প্রভৃতি যে সমস্ত উপন্যাসের নাম এলোমেলোভাবে মনে পড়ছে বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে যে কোন ভাষায় সেগুলি সম্মানের আসন দাবী করতে পারে।

শুধু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি বইএর দিক দিয়ে নয়, বাংলার উপন্যাস-সাহিত্য সুদীর্ঘ ও ব্যাপক সাধনার দিক থেকেও আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ। সার্থক ঔপন্যাসিকও দু'জাতের। কোন ঔপন্যাসিককে পৃথকভাবে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টির ভেতর দিয়ে বিচার করা যায়, আর কাউকে করতে হয় তাঁর সারাজীবনের সমস্ত দানের সমগ্রতায়। দ্বিতীয় জাতের স্রষ্টা বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে পৃথকভাবে সার্থক হলেও তাঁর জীবন-বোধের সম্পূর্ণ তাৎপর্য তাঁর সমস্ত রচনাকে আশ্রয় করেই পরিস্ফুট হয়। চৈতালি ঘূর্ণি, রাইকমল, জলসাঘর, ধাত্রী দেবতা থেকে নাগিনী কন্যার কাহিনী, বিচারক, পঞ্চপুত্তলী পর্যন্ত অসংখ্য উপন্যাসে বাংলার এ যুগের অতুলনীয় বিরাট ভাষ্য যিনি রচনা করেছেন, জীবন সম্বন্ধে তাঁর মত স্রষ্টাদের ভূয়োদর্শনের অনস্বীকার্য মূল্যের মধ্যেই উপন্যাসের অমরতা স্বতঃসিদ্ধ।

সূর্যের আলোয় সব আতশবাজিই অচল।

কিন্তু সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে এ উপমা ঠিক বোধ হয় খাটে না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সর্বব্যাপী প্রভাব যখন অনতিক্রমণীয়, বিশালতায় না হোক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে দু-চারটি প্রতিভার আশ্চর্য দীপ্তি, তখনও আমরা দেখেছি।

কবি মোহিতলাল এই বিশিষ্টদের মধ্যেও বিশেষ একজন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই তাঁর অমোঘ প্রভাব—এড়িয়ে গিয়ে নয়, আত্মসাৎ করে, বাংলা কাব্যে প্রথম স্বতন্ত্র নতুন স্বাদ যদি কেউ এনে থাকেন, তাহলে তিনি কবি মোহিতলাল।

রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখেই গত পাঁচ দশকে বাংলা কাব্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আন্দোলনে দুলেছে। সে আন্দোলনে ঝড়ের মত অকস্মাৎ দিগ্বিদিক আলোড়িত করে যাবার দৃষ্টান্তও আমরা দেখেছি। কিন্তু বিদ্রোহের যে ঝটিকা আমাদের সচকিত বিস্মিত করে আমাদের দৃষ্টিকেও কিছুকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছে, উৎপত্তি খুঁজতে গেলে দেখা যাবে সে ঝড় গভীরতর এক আলোড়নের প্রতিক্রিয়া মাত্র। সে আলোড়নের মূলে আছেন কবি মোহিতলাল। তাঁর সংযত সংহত শক্তি ঝটিকার আস্ফালনে কখনো দেখা দেয়নি কিন্তু

বাংলা কাব্যের রীতি ও প্রকৃতির গোড়া ধরে তিনিই প্রথম নাড়া দিয়েছেন।

মোহিতলালের কাব্যজীবন যখন শুরু তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তি স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য-জগতে পরিব্যাপ্ত। এক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাদে নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে অটল হয়ে থাকবার মত শক্তিমান কবি তখন নেই বললেই হয়। এই সময়ে প্রায় গতানুগতিকভাবেই ছন্দ ও ভাষার কিছু কুশলতা নিয়ে মোহিতলাল তাঁর প্রথম কবিতা রচনা শুরু করেন। কিন্তু স্বপন-পসারী গোড়া থেকে পড়তে আরম্ভ করলেই দেখা যাবে ছুটি কি তিনটি কবিতার পরই দুর্বল একটি ক্ষীণ কাব্যধারা যেন হঠাৎ বিপুল প্লাবনের বেগ কোন অফুরন্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করেছে। এ বেগ ও বলিষ্ঠতা বাংলা কাব্যে তখন অনুপস্থিত ছিল একথা যেমন বলা যায় না, তেমনি সেই সঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে, তার এই বিশেষ প্রেরণা ও প্রকাশভঙ্গি আগে কখনও দেখা যায় নি।

মোহিতলালের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল প্রথম কবিতা বোধহয় 'অঘোর-পন্থী'। এ কবিতা প্রকাশিত হওয়ামাত্র তখনকার সাহিত্য-যুব-জন-চিত্ত যে জয় করে নিয়েছিল তার প্রধান কারণ হয়ত তার মাত্রাহীন উগ্রতা, কিন্তু উগ্রতাই তার সব নয়। এই উগ্রতার পেছনে আরো গভীর এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পাঠক-মন যার জন্যে তখন নিজেরাও অজ্ঞাতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানত চাকুরে বাঙালীর সৃষ্টি বললে খুব ভুল বলা হয় না। সেই চাকুরে বাঙালী

তার সুখস্বপ্নের রাজ্যের ভাঙন সম্বন্ধে তখনই ভালো করে সচেতন হতে শুরু করেছে। আসল ও নকল অধ্যাত্মচিন্তার শৌখিন বিলাসে তেমন রুচি আর তার নেই। এই কিছুটা দিশাহারা কিছু বাস্তবতা-সন্ধানী বাঙালী পাঠক-মন মোহিত-লালের কবিতায় যেন তাদের মনের আংশিক প্রতিধ্বনি প্রথম খুঁজে পেল।

উর্ধ্বমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা মাধবী
নেহারিয়া নীহারিকা-ছবি,
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি' নিরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,—
বুভুক্ষু মানব লাগি রচি' ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব
হে কবি-বাসব?

দেহবাদ বলে এ কাব্য-প্রেরণার ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ নামকরণ যাঁরা করলেন, এ কাব্যের বলিষ্ঠ বেগ তাঁরাও পরোক্ষভাবে স্বীকার না করে পারলেন না। এ বলিষ্ঠতা শুধু সাময়িক উত্তেজনায় পুষ্ট হলে কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে তার আবেদন অনেক আগেই ক্ষীণ হয়ে যেত, তখনকার অনেক কবিতারই যা হয়েছে। কিন্তু মোহিতলালের বলিষ্ঠ বেগের উৎস কোন বাহ্যিক বিপর্যয়ের মধ্যে নেই। তা আরো অনেক গভীর। আমাদের জীবন-বোধের তীব্রতা থেকেই তা উৎসারিত। যে বেগ অক্ষম হাতে শুধু উগ্রতায় অপব্যয়িত হতে পারত মোহিতলালের হাতে তা এমন একটি সুতীব্র

স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে, কাব্যরীতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যার মূল্য আজও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মৃত্যুর বরণ নীল—শুনেছিনু কবে সে কোথায়!
যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘন-শ্যাম?
অথবা গরল-দ্যুতি হর-কণ্ঠে নয়নাভিরাম?

উমার কপোল-শোভী সে কি নীল অলকের প্রায়?
অতিদূর কূলে যথা তালীবন-রেখা দেখা যায়—
নিবিড় আয়স-নীল!—তেমনি সে আঁখির আরাম?
কিম্বা সে কি দিকপ্রান্ত আচম্বিত বিদ্যুতের দাম,
ভীষণ নিঃশব্দ-নীল?—পরে সে অশনি গরজায়!

উপমা মনেরি খেলা; প্রাণ বুঝে উপমা-বিহনে,
সে যে নীল—নহে রক্ত, পীত, কিম্বা ধূমল, ধূসর;
নীলাকাশতলে যথা সিন্ধুজল নীল নিরন্তর,—
তেমনি মৃত্যুর ছায়া চেতনার অগম-গহনে!
সে নহে যমুনা-জল, নব-ঘন অথবা গগনে,—
মহাশূন্যে!—তাই নীল, নীল যথা অসীম অম্বর।

শুধু বেগের দিক দিয়ে নয়, বক্তব্য ও বলার ভঙ্গির দিক দিয়েও মোহিতলালের বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই সুপরিস্ফুট। ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতির বাইরে কাব্যের উপাদান সংগ্রহে তিনি সহজে সম্মত নন, কিন্তু সেই মৃত্তিকাশ্রয়ী অনুভূতির এমন তীব্র তপ্ত গাঢ় স্বাদ এমন সুনিপুণ হাতে কেউ বুঝি আগে পরিবেশন করেন নি।

দেহবাদ নয়, মোহিতলালের কাব্যের সত্যকার প্রেরণা

হল মোহমুক্ত সবল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দুরন্ত জীবন-পিপাসা। একদিকে যেমন ধোঁয়াটে ভাবের অস্পষ্টতা তাঁর অসহ্য, আরেক দিকে এই জীবনের তীব্র তৃষ্ণাও উচ্ছ্বাসের তরলতায় প্রকাশ করার তিনি বিরোধী। তাঁর কবিতার প্রচণ্ড আবেগও দৃঢ় অকম্পিত রেখায় রূপায়িত। তাঁর কাব্যে তাই ভাস্কর্যের কঠিন সূক্ষ্ম সুষমা। স্থাপত্যের মহান অটল গাম্ভীর্য।

বাংলা কাব্য স্বাভাবিক নিয়মেই বর্তমানে নতুন দিগন্ত সন্ধানে উৎসুক একথা সত্য, কিন্তু পরিচিত তীর থেকে পরম দুঃসাহসে প্রথম যিনি তরীর নোঙর তুলেছিলেন, দুই যোজকের মাঝখানে তাঁর বিরাট বলিষ্ঠ কাব্য-কীর্তি চিরদিন সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার একটি ব্যস্ততম রাস্তা। নিচে বাজারের অবিরাম হট্টগোল আর ওপরে প্রকাণ্ড ঢালাও ছাদে একটি মাত্র আফিসঘর।

আফিসঘরটি একটি প্রেসের। ব্যাঙের ছাতার মত একটি সদ্যোজাত সাপ্তাহিক পত্রিকা সেই আফিস থেকে তখন বেরিয়েছে। সম্পাদনার ভার আমার ওপর।

কাগজটির নাম করব না, কারণ প্রকাশকে সব আশা ও আমার মত কয়েকজন কর্মীর সমস্ত স্বপ্ন ধুলিসাৎ করে নাম রাখবার মত কিছু করবার আগেই তার আয়ু ফুরোয়।

তবু সেই কাগজ ও কাগজের অফিস ঘরটি আমার কাছে আজো যে স্মরণীয় হয়ে আছে তার কারণ বিশেষ একজনের স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িত।

সে বিশেষ একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই অফিস ঘরেই প্রথম আমার সাক্ষাৎ। লেখা দিতে সে অফিসঘরে তিনি আসেননি, সে-কাগজে কোন লেখাও তাঁর বার হয়নি। তিনি এসেছিলেন আর একজন বন্ধুর মারফৎ আলাপ করতে।

তাচ্ছিল্য অবশ্যই করিনি কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আলাপ হয়েছে নেহাৎ ভাসা ভাসা ক্ষণিকের। আর পাঁচ

জন সাহিত্যযশোপ্রার্থী নতুন লেখকের থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখবার মত কোন কারণ ছিল না।

শুধু তাঁর চেহারাটা ছাড়া।

ঢালাও ছাদের নিঃসঙ্গ অফিসঘরের একটি মাত্র বেশ উঁচু দরজা পূব দিকে খোলা। প্রথম প্রবেশের সময় সেই দরজার মাথা পর্যন্ত ছোঁয়া তাঁর সুদীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ চেহারা আমার মনে কেমন করে মুদ্রিত হয়ে গেছে। বিকেলের ধূলিমলিন আকাশের পশ্চাৎপটে সেই নিঃসঙ্গ মূর্তির সঙ্গে নিচের বাজারের হট্টগোলটুকুও।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ভাবতে গেলে আমার সেই সেদিনের প্রথম দেখাটাই সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহিত্যিক ও মানুষ হিসাবে আমি যা বুঝেছি ও জেনেছি তার সঙ্গে ও ছবির কোথায় একটা মিল পাই বলেই হয়ত।

যত বিশেষই হোক ও-ছবি বেশী দিন অম্লান নিশ্চয় থাকত না, যদি না কয়েকদিন বাদেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে দেখা করতে আসতেন। এবার তিনি শুধু আলাপ করতে আসেন নি। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন গুটি ছয় সাত গল্পের পাণ্ডুলিপি আমায় দেখাবার জন্যে।

তাঁর কিছু আগেই আমি কলম ধরেছি, সুতরাং এরকম ভাবে গল্প দেখাতে নিয়ে আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। নতুন যাঁরা লেখেন অগ্রজদের কাছে এরকমভাবে অনেকেই তাঁরা লেখা যাচাই করতে আনেন। আমার কাছে এরকম লেখা দু'চার জনের তখন আসে।

গল্পগুলি দেখে রাখব বলে সপ্তাহখানেক বাদে তাঁকে আসতে বলেছি। তারপর নিজের স্বাভাবিক আলস্যে ও অন্যমনস্কতায় সেগুলির কথা ভুলেও গেছি। যেমন আর পাঁচজনের লেখা পাই তা থেকে এ-লেখাগুলি সম্বন্ধে আলাদা আগ্রহ জাগবার কোন হেতুও ছিল না।

যেদিন লেখকের আসবার কথা ঠিক তার আগের দিন রাত্রে সৌভাগ্যক্রমে লেখাগুলির কথা মনে পড়েছে। তাড়াতাড়ি সেগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে বসেছি।

বুলোতে গিয়ে চোখ সত্যিই স্থির হয়ে গেছে। সমস্ত গল্প একবারের জায়গায় দুবার করে পড়া শেষ না করে উঠতে পারিনি।

পরের দিন অধীর আগ্রহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার জন্যে অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তিনি আসবার পর কি করে আমার কথা তাঁকে বোঝাব ভেবে পাইনি।

এ'ত শুধু বিস্ময় কৌতূহল প্রশংসা নয়, তার সঙ্গে কি একটা অস্ফুট যন্ত্রণা যেন মেশানো।

বিস্ময়, আশ্চর্য অসামান্য একজন লেখকের আকস্মিক আবিষ্কারে, কৌতূহল তাঁর লেখার অদ্ভুত ব্যতিক্রমের মূল সম্বন্ধে, প্রশংসা তাঁর সহজাত অনায়াস রচনাকৌশলের জন্যে, আর যন্ত্রণা তাঁর স্রষ্টা মনের সেই দুর্বোধ বিকলতার আভাসে জীবনের গভীর প্রতিচ্ছবিও যাতে কেমন একটু বাঁকা হয়ে ছাড়া দেখা দেয় না।

কি তাঁকে বলেছিলাম যথাযথভাবে মনে নেই। শুধু এইটুকু তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, সাহিত্য সম্বন্ধে যেটুকু বোধ

আমার আছে তাতে তাঁর প্রতিভা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট। সেই সঙ্গে সে প্রতিভা কতদিনে কতখানি স্বীকৃতি পাবে সে বিষয়ে একটু সন্দেহও প্রকাশ করেছিলাম মনে আছে। কারণও জানিয়েছিলাম এই যে সাধারণত সুস্থ বলতে যা সবাই বোঝে তাঁর প্রতিভা তা নয়।

লেখক হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেদিন যতটুকু জেনেছিলাম তারপর আরও অনেক গভীর ও বিস্তৃতভাবে তাঁকে জানবার সুযোগ দেশের সমস্ত অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে আমিও পেয়েছি।

শুধু লেখক হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবেও তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ তার পরে আমার হয়েছে। কিন্তু সমস্ত জানার পরেও প্রথম দিনের সেই ছবি ও প্রথম লেখা পড়ার সেই অনুভূতি ও ধারণার আমূল কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

ছেচল্লিশ বছরের জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কম কিছু লেখেননি। পুতুল নাচের ইতিকথার মত বাংলা সাহিত্যে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবার মত রচনা তার মধ্যে যেমন আছে তেমনি এমন রচনাও হয়ত আছে নেহাৎ জীবিকার্জনের দায়ে প্রকাশকের হাতে যা তাঁকে অনিচ্ছায় তুলে দিতে হয়েছে। কিন্তু লেখার নিপুণ হাত বাইরের নানা কারণে যেখানে তাঁর শিথিল ও ক্লান্ত সেখানেও তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দীপ্তি থেকে থেকে চাপা থাকে না। এইটিই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার।

এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁর স্রষ্টা মনের অভিনব

গড়নের জন্যে, যে গড়নের মধ্যে তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য উদ্ভাসনের তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আংশিক ব্যর্থতার রহস্যও নিহিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরলতম লেখকদের একজন জীবনে ও সাহিত্যে মানব-সত্তা যাঁদের অভিন্ন। ফলে ছাঁটা মাপসই মানুষদের মাঝখানে বিসদৃশ বেমানান প্রাণবেগ ও ঘোলাটে মুখস্থ ধারণার জগতে অন্তর্ভেদী স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে আসবার যে ট্র্যাজিডি তাই তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকে স্পর্শ না করে ছাড়েনি।

জীবনে ও সাহিত্যে তাঁর দুরন্ত প্রাণবেগ সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদ ওঠবার যদি কোনো অবকাশ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে দায়ী সেই কাল ও সমাজ এ প্রাণবেগকে সহজ স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে দেওয়ার মত সুবিন্যস্ত দৃঢ়তা যার মধ্যে এখনো অনুপস্থিত। তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ সুস্থতা সম্বন্ধে যদি কোথাও সন্দেহ জাগে তাহলে নিজেদের সুস্থতার স্বরূপও আমাদের আগে বিচার করা দরকার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গোত্রছাড়া প্রতিভা যে উৎকেন্দ্র তার কারণ আমাদেরই অসম বিন্যাসের বিশৃঙ্খলা, তাঁর রচনায় যেটুকু অসুস্থতার ছায়া তা আমাদেরই রুগ্নতার প্রতিবিম্ব।

মাঝারি মাপের মানুষ হলে এবং জীবন ও সাহিত্য তাঁর অভিন্ন না হলে হয়ত অনেক কিছু তিনি মানিয়ে নিতে পারতেন; রচনায় ও জীবনে তেমন একটা সুলভ সৌষ্ঠব

রেখে যাওয়াও তাঁর সাধ্যাতীত হত না, সাবধানী সুবিবেচকদের বাহবা যাতে সহজেই পাওয়া যায়।

কিন্তু কোন দিকেই মাঝারি হবার সৌভাগ্য নিয়ে তিনি আসেন নি। চূড়াও যেমন তাঁর মেঘ-লোক ছাড়ানো, খাদও তেমনি অতল গভীর। তাই মানিয়ে নেবার মানুষ তিনি নন।

যেখানে নিজের এই অসামান্য সত্তাকে অস্বীকার করে মানিয়ে নিয়ে মাপসই হবার স্বভাববিরুদ্ধ চেষ্টা তিনি করেছেন সেইখানেই তাঁর ব্যর্থতার ফাঁদ তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে পেতেছেন।

যে দলের মধ্যেই তিনি থাকুন, সমস্ত দলের ঊর্দ্ধে তিনি সেই নিঃসঙ্গ সরল অতিকায় একাগ্র উদ্দাম চিরকিশোর জীবন-সন্ধানী—মাঝারি মানুষের তৈরী জগতে পায়ে পায়ে হোঁচট খেয়ে দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে নির্বোধ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে অবিরাম যুঝে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকালে যাঁকে বিদায় নিতে হয়।

অকালে অকৃতার্থরূপে বিদায় নিলেও আমাদের জীবন-বোধের ভূয়ো আত্মপ্রসাদের ভিৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ একটু নাড়িয়ে যায় নাকি ?

আজকালকার কবিতার যাঁরা নিয়মিত পাঠক, আধুনিক কবিতা বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে একটা ধারণা নিশ্চয়ই তাঁদের আছে বা হয়েছে। দুঃখের সংগে স্বীকার করছি আমার নিজের ধারণা এবিষয়ে একটু সংশয়াচ্ছন্ন।

ইদানিং যা লেখা হচ্ছে তাকেই আধুনিক কবিতা বলে ধরে নিলে সব গোল যদি চুকে যেত তা হলে ভাবনার কিছু ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ বোধ হয় নয়। যাঁরা প্রাচীন প্রবীণ তাঁরা সবাই সদলে কিছু কবিতা লেখা ছেড়ে দেন নি। আজকাল তাঁদের কবিতাও বার হয়, যথাযোগ্য সমাদরও পায়। কবিতার বদলে কবিদের বয়স ধরে যদি আধুনিকতা বিচার করতে বলি, তাতেও বিপদ আছে। একালে লিখছেন বলেই তাঁরা সবাই এক জাতের মার্কামারা নয়। প্রবীণদের সংগে সাম্প্রতিকদের যদি তফাৎ থাকে সাম্প্রতিকদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য তার চেয়ে বড় কম নয়। শুধু আনকোরা আধুনিক বলে আখ্যাত হওয়া তাঁদের কেউ কেউ সম্মানের বলে নাও মনে করতে পারেন। বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন বলেই ভুঁইফোড় বলে নিজেদের হয়তো তাঁরা মনে করেন না, শিল্প সাহিত্যের আর্যঋণ যে সকলকেই নিতে হয় ও ঐতিহ্যের ধারা বেয়েই যে নতুন অভিযানের প্রেরণা পাওয়া যায়—এ সত্য হয়তো তাঁরা মানেন না।

আসল কথা কাল যখন থেমে নেই, তখন আধুনিক কবিতা বস্তুটা সব সময়েই থাকবে, কিন্তু সেটা সত্যি কবিতা কিনা সেইটাই হলো আসল বিচার্য। শুধু আধুনিকতার তকমা এঁটেই কবিতার তক্ত দখল করা যায় না।

কালও যেমন থেমে নেই, কবিতা লেখার পরীক্ষা নিরীক্ষাও তাই, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সার্থক নতুন কবির লেখাতেই তা চলছে। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে প্রবহমান নদীর যে ছবি সাধারণতঃ আমাদের মনে জাগে সাহিত্য বা শিল্পকলার জগতে তার উপমা খাটেনা। অবিরাম এগিয়ে চলাই কালের ধর্ম। নদীরও তাই। অগ্রগতির সঙ্গে উন্নতির ধারণা আমাদের মনে আবছাভাবে জড়িত বলে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অতীতের চেয়ে বর্তমান সব সময়ই বেশী উৎকৃষ্ট— এমন কথা যদি আমরা ভাবি, তার চেয়ে ভুল আর কিছু হতে পারে না। শিল্প সাহিত্যে সেকাল একাল আছে—কিন্তু তা উৎকর্ষবাচক নয়। শিল্প সাহিত্যের হওয়া না হওয়া কালাতীত। ভাষা বদলায়, ভংগি বদলায়, স্বাদ সুর ও বিষয়, জটিল কি সরল, বিস্তৃত কি সংকীর্ণ হয়, কিন্তু আসল জায়গায় পৌঁছবার জন্যে শিল্প সাহিত্যকে কালের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় না। মহৎ সার্থক শিল্পসাহিত্য একালে যেমন সৃষ্টি হতে পারে সেকালেও তেমনি হয়েছে। বেদের কবিতা যেখানে পৌঁছেচে আধুনিক কবিতার তার ওপরে কোথাও গন্তব্য নেই।

আধুনিক কবিতার শব্দবৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনার কথা বলতে গিয়ে এ দীর্ঘ ভূমিকা করার উদ্দেশ্য আধুনিক কবিতাকে ছোট

করা নয়, তার কালাতীত সার্থকতা বিচারের জন্যে সাময়িক নামের মোহ কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা।

শব্দই কবিতার বাহন, এমন কি কারুর মতে প্রাণও। কবিতার শব্দ ঠিক আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ভাষার শব্দ ত নয়। এমন কি গদ্য সাহিত্যের শব্দও না। সে শব্দের শুধু শ্রুতিগোচর ধ্বনি ও বুদ্ধিগোচর অর্থ ই নেই, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শব্দের যাকে বলা হয় অনতিস্ফুট চিত্র-পরিবেশ ও ভাবসংকেত।

শুধু আধুনিক নয় চিরন্তন কবির রচনা থেকে দুটি উদাহরণ দিই—

হে হংস বলাকা
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া তুলিল আকাশে।

কিম্বা—

আমি কান পেতে রই আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি যে
কোন রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে।

এ দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতের দুটি কবিতাংশেই অসামান্য কৌশলে মেশান শব্দগুলি চিত্র-পরিবেশ ও ভাব-সংকেতের সাহায্যে সাধারণ বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে এমন এক দুর্লভ অনির্বচনীয়তায় আমাদের পৌঁছে দেয়, শুধু শব্দের অভিধান ঘেঁটে যার হদিস মেলবার নয়।

প্রথমেই তাই এই কথাটা বলে রাখতে চাই যে শব্দের প্রয়োগ সংযোগের রহস্য শুধু আধুনিক নয়, সকল যুগের সকল দেশের কবিকেই তন্ময় করেছে। এ তন্ময়তার আসল লক্ষ্য অবশ্য শব্দের যে ইংগিত প্রতিদিনের ব্যবহারে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাই উন্মোচিত করে দিয়ে কবিতার অভিনব ব্যঞ্জনা। শব্দের এই ধ্যান-ধারণা কালিদাসও করে গেছেন, সেক্সপিয়রও। আধুনিকদের সম্বন্ধে এইটুকু শুধু বোধ হয় বলা যায় যে তাঁদের মত ব্যাপক সচেতনতা আগেকার যুগের কবিদের এ বিষয়ে ছিলনা। আধুনিক কবিতায় শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ ও প্রাচুর্যের মূলে ভাষার ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি অবশ্য আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী যা আছে—তা হলো মানুষের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার নব নব ক্ষেত্রে প্রসার। কবিতা যেখানে পৌঁছতে চায় সেই গহন গভীর রসলোক চিরকালই নিশ্চয় এক, কিন্তু আধুনিকদের সামনে তার পথ নানা দিক দিয়ে খোলা, উপকরণও তাদের অজস্র। সে উপকরণের সদ্ব্যবহার কতখানি হয়েছে তার বিচার মুলতুবি রেখে এটুকু অন্ততঃ বলা যায় যে কবিতার রাজ্যে শব্দের অস্পৃশ্যতা আগের মত আর নেই।

আগ্নেয়গিরি পাঠালো যে এই রাত্রি
গলিত ধাতুরা জমাট কখন বাঁধবে ?
ব্যবসায়ী মন মাহেন্দ্রক্ষণ খুঁজছে
টিকটিকি ডাকে,—বধির সে নির্বন্ধ।
ঘড়ির কাঁটায় কত যে মিনিট মরেছে
মনে অন্তর সময়ের অধিরাজ্য,

ভুলেছি জ্যোৎস্না হারিয়ে হরিৎ ধান্য
এখানে বন্দী আনা তিনেকের বাল্‌বে।
কিম্বা—
ফাল্গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক বদলাবে।
কথোপকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তি সিঁড়ি
অবশ্যকর্তব্য নীড়।' মড়াকাটা ঘর—স্থানাভাবে ?
নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী, ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি হ'তে হোতো হাবভাবে।
বিকৃত মস্তিষ্কচাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী।

এই দুটি কবিতাংশে যে সব হরিজন শব্দ সমাদর পেয়েছে, শ্লেষাত্মক কবিতার ছুৎমার্গ একটু শিথিল হলেও এ শ্রেণীর জাতকাব্যে তাদের জায়গা ছিল না বললেই হয়।

আধুনিক বলে নিজের পরিচয় দিতে যিনি হয়ত আপত্তি করবেন একালের তেমন একজন বিশিষ্ট লেখকের শ্লেষাত্মক নয়, সত্যকার বনেদি ধ্রুববাদী কবিতা থেকেও শব্দের এই অন্ত্যজদশা দূর হওয়ার দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে—

শূন্য ব্রহ্মপুত্র-চর সীমান্ত অবধি
অবসন্ন একটানা। বালুজমি পরে
বাড়িতেছে তরমুজ যতদিন নদী
নাহি জাগে পুনর্বার ম্লান দিগন্তরে
গাড়ো পাহাড়ের লেখা ; সন্ধ্যার আঁধার
নামে ধীরে, ঝিল্লী ডাকে, জোনাকী চমকে
বিলম্বিত তরণীর ঘাটে ফিরিবার
করুণ আহ্বান ক্ষীণ অশ্রু মোর চোখে।

এ কবিতার গাঢ় গভীব শাশ্বত সুরে আপাদবিবাদী তরমুজ আমদানী করার সাহসী পরীক্ষা আগে তেমন হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

আধুনিক কবিতার শব্দের অস্পৃশ্যতা শুধু দূর হয়নি, উচ্চ-নীচ কুল থেকে এমন সব শব্দ এসেছে ভীড় করে, কাব্যের জগতে যাদের যাতায়াত কখনো ছিল না।

হয়তো ঈশ্বর নেই স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ
কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিব্যক্ত হ্রাসে
বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে
জঙ্গলের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত॥

কিম্বা—   এরা কারা,
হোহো হাসি পান খায়, দোক্তার দোকান লাল জল
বড়ো বাজারের দৈন্য গৃধ্নুতার ; কলকাতা, ফিরে যাবো
দরজা বন্ধ করে ধড়াস বুকের মধ্যে, একা
বসন্ত রাত্রির ঝড়ে দৃষ্টিভরা একটি সে কাহিনী
কুসুম সংকীর্ণ গলি, কোথা সেই দরজা পারের
গাছে পরিচ্ছন্ন বাসা। চিহ্নহারা।

আধুনিক দু'জন শীর্ষস্থানীয় কবির রচনা থেকে দু'দিকের এ দুটি প্রত্যন্ত উদাহরণে সাধারণ কাব্যরসিকেরা যদি একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের বোধ হয় মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে কবিতা একান্ত সহজ সর্বজনবোধ্য হবে একথা আধুনিকদের একটি দল অন্ততঃ মানেন না। কবিতা লিখতেও যেমন, পড়ে উপভোগ করতেও তেমনি প্রস্তুতি দরকার। ছবির চোখ কি

উচ্চাংগ গানের কান যেমন সকলের সহজাত নয়, কবিতার রসোপলব্ধিও তাই। আধুনিকদের অনেকের অন্যতম গুরুস্থানীয় ফরাসী কবি আরাগঁর এ বিষয়ে উক্তি আধুনিক এক কবির অনুবাদ থেকেই এখানে খানিকটা তুলে দিচ্ছি—

'ভাষার গভীর চর্চ্চা ছাড়া, প্রতিপদে ভাষার পুনর্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারবার ভাঙতে হয়। কবিদের পক্ষে এই-ই তো মুক্তির পথে দীর্ঘ উত্তরণ।'

অন্যত্র আরাগঁ বলছেন—'কাব্যের ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস। যাঁরা আমাদের নীরব করতে চায়, তারা সেই শ্রেণীর নিকৃষ্ট লেখক যারা কিছুই নির্মাণ করেনি, যারা শুধু গোটাকয়েক ছক টেনে প্যাঁচ কষেই ক্ষান্ত হয়।'

আধুনিকদের সবাই কিন্তু এই মতের বলে মনে করার কোন কারণ নেই। শব্দ ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতার নীতি সমর্থন করলেও ব্যঞ্জনার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতে অনেকে রাজি নন। ভাষার অপ্রত্যাশিত অনভ্যস্ত ব্যবহারের কৌশলে ব্যঞ্জনার বিচিত্র সুরসৃষ্টিতে সাফল্যলাভের দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

কৃতিত্বের তুলনায় অত্যল্প পরিচিত আধুনিক এক কবির দুটি কবিতাংশে একথার সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে।

পিছিয়ে জগৎ টাল সামলায়
আঁকড়ে জমাট নগর বাজার
কাছেই দুচার বৈরাগী তটে
পৌঁছোয় ঢেউ মুঠি ছাড়াবার ;

কে তুই এখানে, এলানো বালির
আলগা আলিঙ্গনের বাসায়!
কিছুক্ষন তোর তারকা স্থচল
কিছুবা সাগর কাড়ে কুয়াশায়?
ডুবে ভেসে কবি বল পাবি কাকে?
—'নতুন আশাকে—নতুন ভাষাকে!'
অথবা,
কিছু নেই যাতে একটুকুতেই
তাল পাখা নাড়ে স্থর পথ পায়?
দেহের তুরগ রথে না জুতেই
সময় পারের আছে কি উপায়?
দূর হ'বে স্থখ দুখের শস্য
সৌমনস্য দৌর্মনস্থ,
সূর্যাস্তের মেঘলীলাবৎ
নিভে যা আমার দৃষ্টিজগৎ
ছেড়ে ভাব আর বাণীর বিত্ত
নিভে যা আমার সজাগ চিত্ত।
দেহচিত্তের ছায়া লুকুতেই
কোন সার্থক পথ পাওয়া যায়?
কোন দোর খোলে ছুঁতে না ছুঁতেই
হায় তথাগত কোথায় কোথায়!

দুটি কবিতাই চিরকালের ভাবনায় নতুন কালের স্থর দিয়েছে।

আমাদের অভ্যস্ত বা চেনা নয় এমন রসের অনির্বচনীয়তায়

পৌঁছোবার চেষ্টাও উপেক্ষা করবার নয়। শব্দ-সংযোগের অনাবিষ্কৃত রসায়নই এসব কবিতার পরীক্ষা-প্রয়াস।

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে
বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার
এক-দুই-তিন-চার-অজস্র-অপার—
রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে, ছুটিতেছে ছুটিতেছে তারা।
তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু' একটা কল্পনার হাঁস
কিম্বা,
মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে
বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা,
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো,
এখনো নারীর মানে, তুমি, রাধিকা ফুরালো।

এসব কবিতা পরীক্ষার খাতায় ব্যাকরণসম্মত ব্যাখ্যা করবার মত হয়তো নয়, কিন্তু নেহাৎ বিরূপ হবার পণ করে না বসলে নিতান্ত দীক্ষাহীন শ্রোতারও মনের যেখানে এ কবিতার স্পন্দন পৌঁছতে চায়, আধুনিক কবিতার সে লক্ষ্য অবজ্ঞার বস্তু নয়।

আধুনিক কবিতার সবই অবশ্য অস্পষ্ট ধূসরতা নয়। তরুণতম কয়েক জনের লেখায় নতুন সম্ভাবনার ইংগিত সত্যিই উজ্জ্বল।

আমি যে এসেছি সে যেন জানতে না পায়।
দূরে, হেলঙের পাহাড়, পাহাড়তলি
ছাড়িয়ে পিপলকোঠির চড়াই আর
তারপর সাঁকো। বাঁয়ে গেলে গঙ্গার
ধারে সেই গ্রাম আমৌঠি রঙ্কোলি।

অর্থহীন কয়েকটা নাম, কিন্তু যে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তার ঝঙ্কারে কবিতার মর্মকথা শব্দের পাখায় উধাও করা হয়েছে তার তারিফ করতেই হয়।

হাতের কাছে না থাকলেও মনের মধ্যে নতুন কবিদের এ রকম উৎকর্ষের বহু কবিতার গুঞ্জনই জেগে আছে। সব শোনাবার সময় নেই।

শুধু এই আশা নিয়েই এ-প্রসঙ্গ শেষ করি যে, বিদেশী নার্শারীর বীজ আমদানি করে নয়, আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যের প্রাণরসেই পুষ্ট হয়ে যে নতুন কৃতী কবিরা আজ মুখর হয়ে উঠেছেন, বাংলা কাব্যের গৌরবময় ইতিহাস উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

কোনো এক বিদেশী লেখকই যেন কোথায় আমাদের আধুনিক সভ্যতাকে এই বলে গাল দিয়েছেন যে, এ সভ্যতা ছন্দহারা বলেই ছন্নছাড়া। সুস্থ সভ্যতা তাঁর মতে গানের ছন্দে দোলানো। উৎসব ও আনন্দ তাতে কাজের অঙ্গ। সুস্থ সুখী চাষী ধান বুনতে গান করে, গান গায় ধান কাটতে। নতুন ধান ঘরে এনে সে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করে। কলের গাড়ির সঙ্গে যন্ত্রযুগের চাকা সবেগে ঘুরতে শুরু করার আগে পর্যন্ত মানুষের যা কিছু কাজ, যা কিছু দায়—সবই আনন্দ-উৎসবের সুরে বাঁধা ছিল। দুঃখ দুর্দশা তখনও ছিল নিশ্চয়, হয়ত বেশীই ছিল, কিন্তু কাজ তখন সাজা ছিল না।

সেই আনন্দের সুর কলের চাকাতেই কি গেল কেটে?

দোষটা সত্যি কলের নয়, কালেরও না। কলই আমাদের কাল নয়, আমরাও কিছু কলের চাপেই বিকল হয়ে পড়িনি। আমাদের প্রাণে সুর এখনও আছে, আনন্দের উৎস এখনও যায়নি শুকিয়ে, শুধু নতুন কালের সঙ্গে তালটা এখনো আমরা মেলাতে পারছি না।

শুধু রেড়িও কি গ্রামোফন, সিনেমা কি স্টেজ দিয়ে সে তাল মেলাবার চেষ্টা অবশ্য বৃথা। মধুর অভাব মেটাতে এগুলো গুড়ও নয়।

আসল কথা যন্ত্র দিয়ে যে যুগে আমরা পৌঁছে গেছি

তারও উৎসব আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, প্রাণের ছন্দে তাকে মিলিয়ে নতুন করে সুর দিতে হবে তার পালায়।

অনেক দেবতা আমাদের ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে আমাদের জীবনেরই নানা প্রভাব ও প্রেরণার প্রতীক। চরিত্র ও প্রকৃতি অনুসারে নানা বাহনে আমরা তাঁদের বসিয়েছি। আমাদের আধুনিক জীবনে বিরাট বেগমূর্তি নিয়ে যে দেবতা আবির্ভূত, যন্ত্রই তাঁর বাহন। এই যন্ত্র-বাহন দেবতারও বীজমন্ত্র আছে নিশ্চয়। সেই বীজমন্ত্র আবিষ্কার করতে পারলে এই দেবতার চেহারাতেও বিভীষিকা কেটে গিয়ে বরাভয় দেখা দেবে।

আমাদের অন্তরের মধ্যেই এ বীজমন্ত্র আছে অনুচ্চারিত হয়ে। নতুন যুগকে ঠিক তার যথার্থরূপে ধারণা করতে চেষ্টা করলে সে মন্ত্র আপনিই আসবে বেরিয়ে,—আসবে নতুন উৎসবে অনুষ্ঠানে, আসবে নতুন পালা পার্বণে।

সত্যিকার পুজো বলতে যা বুঝি, তা একলার, কিন্তু পার্বণ ব্যাপারটা সকলের। যেখানে আমরা সকলের সেখানে আমাদের সমষ্টিগত মন এই পার্বণের ভেতর দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে ও সমৃদ্ধ হয়। অল্পবিস্তর কুসংস্কার গোঁড়ামি মেশানো থাকলেও সব দেশের আগেকার সব পালা-পার্বণেরই সমষ্টি-মনের আনন্দ-পিপাসা থেকে জন্ম। নিছক প্রয়োজনের শ্রীহীন রূঢ়তাকে সেই পিপাসা মধুর করে তুলেছে। ফসল কাটার দায় নবান্নের উৎসবে সার্থক হয়েছে।

পার্বণ ব্যাপারটা গায়ের জোরে অবশ্য গড়ে তোলা যায় না। সমবেতভাবে আমাদের মনে ও বাইরের পরিবেশে তার

প্রস্তুতি অন্তত থাকা দরকার। সেই প্রস্তুতি যেখানে আছে, সেখানে অনুকূল জলহাওয়ার ব্যবস্থা করলে তা সহজেই পল্লবিত মঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

আধুনিক যুগের এমনি একটি পার্বণের সুর আমাদের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে বলে আমার মনে হয়। পঁচিশে বৈশাখ আমাদের কাছে এখন ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল তারিখ শুধু নয়, আমাদের জীবনেও একটি গভীর মহৎ ইঙ্গিত প্রতি বৎসর তা বয়ে আনে।

এই পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে, তাকে কেন্দ্র করে একটি অপূর্ব উৎসব অনায়াসেই গড়ে তোলা যায় না কি? কবি-গুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার মামুলি পন্থা অনেক রকমের আছে। সভা করে বক্তৃতা দিয়ে গানের জলসা বসিয়ে সে সব অনুষ্ঠান যেমন হয় হোক। কিন্তু কবিগুরুর পুণ্যস্মৃতি আমাদের মধ্যে অটুট ও জাগ্রত রাখতে গেলে তাকে আমাদের জীবনযাত্রার ছন্দে মিশিয়ে দিতে হবে। যেমন করে কার্তিকের কুহেলি ঢাকা আকাশে আমরা আকাশ-প্রদীপ তুলে ধরি ঋতুচক্রের আবর্তনে এই বিশেষ দিনটাকে অবলম্বন করে একটি পার্বণ তেমনি গড়ে তুলতে হবে।

নতুন যুগের এ নতুন পার্বণ গ্রন্থ-পার্বণই হোক না কেন! হাতে লেখা পুঁথির যুগ চলে গেছে, মুদ্রিত গ্রন্থই বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি। পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে সাতটি দিন পরস্পরকে গ্রন্থ উপহার দেওয়ার রীতি যদি প্রবর্তন করা যায়, কেমন হয়? পৌষের প্রাচুর্যকে আমরা মিষ্টান্ন পিষ্টক

খেয়ে খাইয়ে সার্থক করি, ঋষি-কবির আবির্ভাব-সপ্তাহ বিদ্যার দীপ্তি ও রসের মাধুর্য আদান-প্রদানে অভিনন্দিত করে তোলার চেয়ে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন আর কি হ'তে পারে!

অন্ন-জল-বায়ুর মত বই আমাদের বর্তমান জীবনে অপরিহার্য। যন্ত্র-যুগের এই মহাসম্পদ নতুন কালের এক অপরূপ উৎসবের উপকরণ হয়ে উঠুক।

এ উৎসব এ গ্রন্থ-পার্বণের জন্যে মনের আবহাওয়া আমাদের তৈরী হয়ে আছে বলেই আমার ধারণা। পূজায় যেমন পুরোহিতের এই নব-পার্বণের জন্যে তেমনি দেশের জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত রসিকদের কাছে শুধু বিধান ও সম্মতিটুকু আমাদের পাওয়ার অপেক্ষা।

শুনতে সোজা কিন্তু প্রশ্ন বড় কঠিন। কি পড়েছি প্রথম জীবনে, মনের ওপর যা কায়েমী ছাপ রেখে গেছে!

ভাবতে গেলে কুল পাই না, সাচ্চা জবাব দিতে গেলে আরো!

ফলাও ক'রে যদি নামজাদা বিশ্ববিশ্রুত কয়েকজন লেখক ও বই-এর নাম করতে পারতাম শোনাতো ভালো। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যভাষণ হ'ত কিনা সন্দেহ হয়।

নামকরা বই অবশ্যই পড়েছি। অন্য কোন লেখা যদি নাই ধরি, শুধু রবীন্দ্রনাথের লেখা দিয়েই যে মনের গোড়া-পত্তন হয়েছে এ কথা বিশদ ক'রে বলবারও দরকার নেই। কিন্তু গোড়াপত্তনই ত শুধু নয়, সাহিত্যসৃষ্টি মনের যে কল্পনা ভাবনা প্রত্যয় সংশয় থেকে উৎসারিত তার মশলা ত আরো অনেক লেখাই যুগিয়েছে।

সে একজন কারুর লেখা নয়, নামকরা কারুরও না হ'তে পারে, এমন কি এমন লেখাও হ'তে পারে যার নাম পর্যন্ত গিয়েছি ভুলে। কিন্তু নাম না মনে থাকলেও এই সব বিস্মৃত রচনার প্রভাব মনের ওপর নিতান্ত কম বলতে পারি না।

জীবনে প্রথম ছাপার অক্ষরে যে লেখা পড়ে অভিভূত হয়েছিলাম, সে লেখার বা তার লেখকের নাম কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে শিশুদের জন্যে পদ্যে লেখা সেটি

একটি বিয়োগান্ত কাহিনী। আমার জীবনে গভীর শোকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার সেই লেখার ভেতর। এখন কোন-রকমে সে লেখা চোখে পড়লে হয়ত তার কাঁচা হাতের ভাষা ছন্দ মিলে হাসি-ই পাবে, কিন্তু মনে আছে সেই শিশুকালে আমার সমস্ত জগৎ ওই লেখা অনেকদিনের মত বেদনায় বিবর্ণ করে দিয়েছিল। সেই লেখা পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছি অনেকদিন। দেখতে পেয়ে মা একদিন সে বই কেড়ে নিয়ে পড়তে বারণ ক'রে দিয়েছেন। তবু তারপরও লুকিয়ে লুকিয়ে সে বই নিয়ে নির্জনে গিয়ে না পড়ে ও না কেঁদে পারিনি। সেটা হয়ত প্রথম কান্নার বিলাস বলবেন কেউ কেউ। কিন্তু আমার বলতে ইচ্ছে করে যে, সৃষ্টি ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে প্রথম অস্ফুট আর্ত জিজ্ঞাসা-ই ছিল সেই লুকিয়ে পড়া ও কাঁদার জেদের পেছনে অগোচরে।

এই জিজ্ঞাসা অনেক কিছুতেই জাগায়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের যা কিছু দেখা শোনা অভিজ্ঞতা সবই বিস্ময় ও বিহ্বল প্রশ্নের কুণ্ডলী পাকিয়ে তোলে মনে। আর সেই প্রশ্ন আর বিস্ময় থেকেই আসে সব সন্ধান ও সৃষ্টির বেগ।

সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে জীবনের অভিজ্ঞতার আমরা খুব বড় মূল্য দিই। দেওয়াটা অন্যায় অবশ্যই বলছি না, কারণ অভিজ্ঞতা চুইয়ে তার নির্যাস নিয়েই যা কিছু সার্থক রচনা সম্ভব। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা যে প্রত্যক্ষই হতে হবে এমন কোন কথা বোধ হয় নেই। যাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলি তাও আমাদের মনের চোখে ধারণা ও প্রত্যয়ের যে চশমা

পরানো থাকে তার মধ্য দিয়েই দেখা। আর ধারণা প্রত্যয়ের এই চশমা আমাদের নিজেদের উদ্ভাবিত ও নির্মিত বেশীর ভাগই নয়। এ চশমা, যা শুনি যা পড়ি তা থেকেই অনেকখানি পাওয়া। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, লেখার পেছনে যেমন দেখা থাকে, দেখার পেছনেও তেমনি লেখা। বিশেষ করে আজকের ছাপার হরফের যুগে লেখার প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নেই। ছাই পাঁশ থেকে উৎকৃষ্ট মহৎ সব লেখাই তা পাওয়ার সুযোগ সুবিধা আর কতকটা সহজাত রুচি প্রবৃত্তি ও জীর্ণ করবার ক্ষমতা অনুযায়ী আমাদের মনের ভঙ্গী গ'ড়ে তাতে রং লাগায়। সেই মন দিয়েই আমরা দুনিয়া দেখতে শিখি।

আমার নিজের বেলা মনের এই ভঙ্গী তৈরীর ব্যাপারে কি বা কোন্ কোন্ লেখার ছাপ পড়েছে তা বলা কঠিন হচ্ছে এই কারণে যে, বই পড়ার ব্যাপারে আমি একরকম সর্বভূক ছিলাম বলা যায়। ভালো মন্দ বই বেছে পড়িনি, বাছবার ক্ষমতাও ছিল না। ছাপার হরফে যা হাতের কাছে এসেছে তাই গোগ্রাসে গিলেছি। নির্বিচারে সে সব বই যেমন পড়েছি তাদের অধিকাংশই তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে মন থেকে মুছে গিয়েছে। তাদের মধ্যে বিষ যদি কোথাও থেকে থাকে তার ক্রিয়া যেমন টের পাইনি, সারবস্তু কোথাও পেয়ে থাকলেও তাই।

তবু বই-এর জগতে এই এলোমেলো যথেচ্ছ বিচরণের মধ্যে আর একটি লেখাও একটু বড় হবার পর চমকে অবাক করে দিয়েছিল এইটুকু মনে আছে। নগণ্য একটি চটি বই,

নাম টাম সবই এখন বিস্মৃত। ঈশ্বর যে আছেন, নাস্তিকদের যুক্তির বিরুদ্ধে তা প্রমাণ করাই সে বই-এর লেখকের উদ্দেশ্য। তাঁর সাধু উদ্দেশ্য একজন কিশোর পাঠকের মনে কি বিপরীত ভাবে সফল হয়েছিল জানলে লেখক বোধ হয় স্তম্ভিত মর্মাহত হতেন। ঈশ্বর যে না থাকতে পারেন, তাঁর থাকা যে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হতে পারে, এই অবিশ্বাস্য কথা সেই বই পড়েই প্রথম সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম। লেখকের ওকালতির দোষে কিংবা আমার মনের গড়নের ত্রুটিতে, যে কারণেই হোক, বিপক্ষ দলের যুক্তিই আমার মনকে বেশী টানল।

মনের এই দোদুল্যমান অবস্থাকে আরো সঙ্গিন ক'রে তোলবার জন্যেই যেন ভাগ্য রাস্তার কোন পুরোন বই-এর দোকান থেকে একটি জীর্ণপ্রায় বই আমার হাতে কৌতুকভরে তুলে দিলে।

ইংরাজিতে লেখা বেশ মোটা একটি প্রবন্ধের বই। লেখকের নাম Ingersoll এইটুকু ভুলিনি। Ingersoll-এর নাম আজকের দিনে প্রায় বিস্মৃত হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তেমন কেওকেটা কোনদিক দিয়েই তিনি নন। গত শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকায় প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহবাদীরূপে নব চার্বাকের মত তিনি তীব্র আন্দোলন চালিয়েছিলেন। আমার পাওয়া বইটি তাঁর সেই অভিযান উপলক্ষে লেখা কয়েকটি জ্বলন্ত ভাষণের সমষ্টি।

সে সব ভাষণের যথার্থ মূল্য যাই হোক, সেই বয়সে আমার সমস্ত জগতের মূল পর্যন্ত তা'তে নাড়া খেয়ে যেন

তছনছ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক নাস্তিক নয়, Ingersoll ছিলেন agnostic। ঈশ্বর আছেন কি নেই কিছুই বলা যায় না, এবং থাকার চেয়ে না থাকার প্রমাণই বেশী, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। এ বক্তব্যের অস্পষ্ট অনিশ্চয়তাই আমাকে সবচেয়ে যন্ত্রণা দিয়েছে। আমার মনের যে সাজানো জগতে পরম সন্তোষে আগে দিন কাটিয়েছি তা হঠাৎ মরীচিকার মত লুপ্ত হয়ে সমস্ত অস্তিত্বের মানেই গিয়েছে বদলে। চেনা ঘর বাড়ি রাস্তা থেকে এ যেন এক মুহূর্তে দিকচিহ্নহীন তেপান্তরের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া।

শোকের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, এবার এল সংশয়। জীবনের নতুন করে দিক নির্ণয় করতে বাধ্য হওয়ার অসহায় বিহ্বলতা।

তারপর,—খুব বেশীদিন পরে বোধ হয় নয়, সেই আশ্চর্য লেখা হঠাৎ একদিন পড়লাম। তুচ্ছ অবজ্ঞাত স্রোতের শ্যাওলার মত সংসারের যত আঘাটা ছুঁয়ে ভেসে যাওয়া একটি ভবঘুরে মানুষের আত্মজীবনীমূলক কাহিনী।

সমস্ত পৃথিবীর রঙ সেই লেখাই এক মুহূর্তে বদলে দিলে। জীবনের সত্যকে এমনি নির্ভীক নিরাসক্ত মন নিয়েই ত খুঁজে খুঁজে ফেরা যায়!

বইটির নাম 'ইন দি ওয়ার্লড' আর লেখকের নাম ম্যাক্সিম গর্কি।

সবচেয়ে আমার কাছে যা মূল্যবান, তাই পেলাম এবার, পেলাম সাহস।

এক হিসেবে আমি পৌত্তলিক। অর্থাৎ যা কিছু বিরাট ধারণাতীত বা তাৎপর্যে অতল তাকে প্রতীকের ইশারা দিয়েই বুঝতে ও বোঝাতে হয় এই আমার বিশ্বাস। তাই আজকের তারিখের উৎসব-অনুষ্ঠান যত কৃত্রিমই হোক তার একটা দাম আছে আমি মনে করি। স্বাধীনতা সহজে উপলব্ধি করার বস্তু নয়, কিন্তু সেই জন্যই তার গভীর অর্থ গৃহচূড়ায় পতাকা উড়িয়ে ইঙ্গিত করতে হয়।

এই বিশেষ দিনটিতে সকালে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় শুয়ে শুয়েই পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের বিউগল ধ্বনিতে কি পাশের বাড়ির রেডিও-নিনাদে সচকিত হয়ে সগর্বে অনুভব করি স্বাধীন ভারতবাসী হিসাবে জীবনের আর একটা বছর কাটালাম।

কিন্তু তারপর মনের দিগন্তে একটা প্রশ্ন কি ঝিলিক দেয় না? অন্ততঃ আমার দিয়েছিল। সত্যিই স্বাধীন ভারতবাসী হিসাবে কোন পরিবর্তন জীবনে টের পেয়েছি কি? বাইরের পরিবর্তনের কথা ভাবিনি। যত কঠোর সমালোচকই হোক তাকে নীরব করবার মত চাক্ষুষ দেখাবার কীর্তি যথেষ্ট সেখানে জাজ্বল্যমান। ভেবেছি ভেতরের পরিবর্তনের কথা। স্বাধীন ভারতের বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার ভিন্ন অনুভূতি কি কিছু হয়েছে?

চট্ করে জবাব দেওয়া কঠিন। জীবন ত' এখনো সেই ছকবাঁধা খাতেই বইছে। মন সেই সব সনাতন সমস্যার জটিলতার মধ্যেই দিশাহারা। হৃদয়ের সম্পর্কের জগতে সেই আগেকার সুরই বাজছে। ফোর্ট উইলিয়ামে গোরা সেপাই নেই—কি রাজভবনে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে না, আমার মত মসীজীবীর অন্তরলোকে তার ছায়া কোথাও পড়ছে কি?

কিছুক্ষণ ভাবলে টের পাই, সত্যিই পড়েছে। আর সেইখানেই আজকের এই বিশেষ তারিখটিতে উৎসব অনুষ্ঠানের সার্থকতা। ভেতরেও যে আমাদের মনের ভিত কখন নিজের অলক্ষ্যে নেড়ে গাঁথা হয়েছে বাইরের এই সাজানো অনুষ্ঠান তা জানিয়ে দেয়।

আমাদের মত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যাদের জন্ম তারা পরাধীনতার একদিক দিয়ে সব চেয়ে গৌরবময় উত্তেজনার আর এক দিক দিয়ে সব চেয়ে গ্লানিকর যন্ত্রণার দিন জেনেছে। উত্তেজনা, শৃঙ্খল মোচনের দুঃসাহসিক ব্রতের, গ্লানি ও যন্ত্রণা,—জাতীয় চেতনার প্রথম সুস্পষ্ট জাগরণের। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের শৃঙ্খল যারা পরিয়েছে স্বাধীনতার স্বপ্ন আমাদের তাদের কাছেই পাওয়া। পরাধীন আমরা বহুকাল থেকেই ছিলাম কিন্তু জাতীয় চেতনা অসাড় ছিল বলেই তেমন করে কোন ব্যথা আমাদের বাজেনি। বিক্ষোভ বিদ্রোহ যেটুকু ইতঃপূর্বে আমাদের মধ্যে দেখা গিয়েছে তা স্থানীয় ও সাম্প্রদায়িক। শঙ্করাচার্যের দীক্ষা পেয়েও ভারতবর্ষকে তার সমগ্রতায় আমাদের ধারণায় কখনো আনবার চেষ্টা করিনি, ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থের বাইরে অন্য

কোন প্রেরণা যদি কখনো আমাদের আন্দোলিত করে থাকে তার উৎস বড় জোর সঙ্কীর্ণ অর্থে জাতি কি সম্প্রদায় কি বড় জোর ধর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। স্বার্থ নয়, সুবিধা নয়, শুধু নিছক স্বাধীনতার জন্যেই স্বাধীনতার আকুলতা যেখানে জাগে, হৃদয়ের সেই জায়গাটুকুকে স্পর্শকাতর করে তোলবার কৃতিত্ব আমাদের বিদেশী শাসকদের—যারা যে বন্ধনে আমাদের বেঁধেছে, নিজেদের অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে তারই টান করা রশিতে মুক্তির টঙ্কারও আমাদের দিয়েছে শুনিয়ে। স্বাধীনতার অভাবটা তীব্রভাবে অনুভব করতে শেখার দরুণই আমাদের যন্ত্রণা ও গ্লানি ছিল অপরিসীম। যারা নিতান্ত অসাড় ও আত্মকেন্দ্রিক এ গ্লানি তাদেরও জীবন সেদিন স্পর্শ করে গেছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী পর্যন্ত তা কিছুটা বিকৃত করে গেছে। আর তার প্রতিক্রিয়া আর সব ক্ষেত্রের মত সাহিত্যেও বাদ পড়েনি। সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যে বিদ্রোহের সুর যে লেখক তোলেনি, তারও লেখার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আগুনের জ্বালাময় রক্তিমা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ফল যে সব সময়ে শুভ হয়েছে তা নয়। বৌ-এর মার গিয়ে পড়েছে অকারণে ঝি-এর ওপর। স্বদেশচেতনার রুদ্ধ বেগ সমাজের বন্ধনের বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও মাত্রা ছাড়িয়েই আছড়ে পড়েছে।

সব চেয়ে যা আমাদের জীবন বিষিয়ে রেখেছিল তা একটা অস্ফুট অস্পষ্ট হীনতার অনুভূতি। সত্যিই শুয়ে বসে স্বস্তি নেই যাকে বলে। আত্মমর্যাদা খুঁজে পাবার জন্যে মোহন-

বাগানকে পর্যন্ত আশ্রয় করেছি, গোরা-সেপাইএর সঙ্গে মারামারি করা বীরত্বের চরম বলে ধরে নিয়েছি, বক্তৃতা মঞ্চের বাজখাঁই গলার আস্ফালনেও অভিভূত হয়েছি।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে মনকে একেবারে চোখ ঠারতে পারিনি। ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে একটা গুমো আগুন কোথায় যেন ধীরে ধীরে সব খাক্ করে দিয়েছে। কারুর ভেতরে সে আগুন বিপ্লবের বিস্ফোরণ হয়ে বেরিয়েছে কারুর তা হয়নি। কিন্তু জ্বলেছি সবাই অল্প-বিস্তর।

তারপর এক শুভদিনে সে গ্লানির অবসান হয়েছে বলে জানলাম। স্বীকার করতে আপত্তি নেই সেই জানা কেমন একটু জোলোই লেগেছে। তার মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা ঠিক পাইনি। যা পেলাম তার পুরো দামটা না দিয়েই যেন পেয়েছি মনের মধ্যে এমনি একটা খুঁত গেছে থেকে। হয়ত সেই জন্যেই নিঃশ্বাসের হাওয়াটা বদলেছে কি না ভালো করে টের পাইনি। বাড়ির ছাদের নিশানটার সঙ্গে হৃদয়টা ঠিক মত মেলে ধরা যায়নি। ছাদে উঠে নগরীর উৎসব-শোভার সঙ্গে তার দৈন্য তার গ্লানিটুকু চোখে পড়েছে। সন্দিগ্ধও হয়ত হয়েছি যা পেয়েছি তার মূল্য সম্বন্ধে।

কিন্তু তার পরেই রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ উপলব্ধি করেছি বাইরে সব কিছু যথাপূর্বম্ মনে হলেও ভেতর থেকে দেখার চোখই গিয়েছে বদলে। পূর্বে যেখানে যা কিছু ক্ষুণ্ণ করেছে, পীড়িত করেছে আজ তার অনেক কিছুই হয়ত বর্তমান। কিন্তু সেদিন অসহায় আক্রোশে যে দৃষ্টি সমুদ্রপারে গিয়ে পৌছোত আজ দেখি তা ফিরে এসেছে

নিজেরই ওপর। অভিযোগ বিক্ষোভ যা কিছু আছে তা আজ আর বাইরের কারুর বিরুদ্ধে নয়। এইটুকু অকস্মাৎ আবিষ্কার করেই চমৎকৃত ও উল্লসিত হয়েছি যে ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরাধ অন্যায় যেখানে যা আছে তা আমার নিজের। স্বাধীনতা আমরা যা পেয়েছি তার সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে আর কারুর বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল না মিটিয়ে কারুর মুখ চেয়ে না থেকে নিজেদেরই নিজেরা আমরা বিচার করতে পারি। প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে নিজেই নিজের আসামী হবার অমূল্য অধিকার আমরা পেয়েছি। অধিকার অমূল্য কিন্তু বড় কঠিন তার দায়িত্ব। এ বিচারে আর কারও দোহাই পেড়ে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই, তার যেখানে যেটুকু শৈথিল্য বা ফাঁকি থাকবে স্বাধীনতাও ঠিক সেই অনুপাতেই হবে নিরর্থক।

আজ তাই সমস্ত উৎসব উল্লাস আমাদের সেই কথায় যেন স্মরণ করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতা মানে মহত্তম বন্ধন,—যে বন্ধনে চিরবিনিদ্র শুভবুদ্ধির শাসনে নিজেরা স্বেচ্ছায় নিজেদের আমরা বাঁধি।

